পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ৩১ যহুর ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ৩১ আগস্ট, ১৯৯৮ ঈসাব্দ

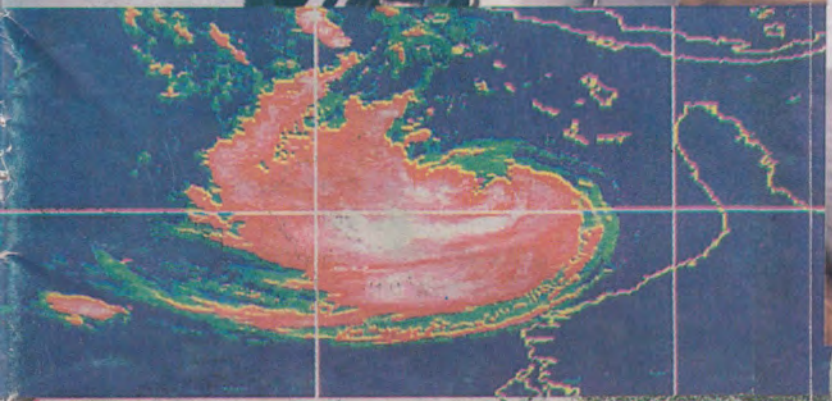

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

দোয়াই আমাদের হাতিয়ার

আল্লাহ্তাআলার সাথে বান্দার যোগসূত্র হলো দোয়া আর উহার কবুলিয়ৎ। মহান আল্লাহ্তাআলা চান যে, তাঁর বান্দারা যাচ্ঞা করুক আর তিনি দেন। এর মাধ্যমে মাবূদ আর আব্দের মধ্যে সম্পর্ক হয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর।

দোয়া নিজের মধ্যে বড়ই শক্তি রাখে। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা কুরআন মজীদ থেকে পেয়ে থাকি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আগুন থেকে অব্যাহতি, হযরত মূসার (আঃ) নিরাপদে সাগর পাড়ি, বদরের প্রান্তরে ক্ষুদ্র একটি দলের বৃহত্তর দলের সাথে লড়াইয়ে জয় লাভ করা কি দোয়ার ফলশ্রুতি নয়? কারও কি তা অস্বীকার করার সাধ্যি আছে? বর্তমানকালে আমরা যে সমস্যা-সঙ্কুল সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি এথেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে আমাদের কাছে দোয়াই একমাত্র সম্বল। আখেরী যামানায় মসীহ (আঃ)-এর জামাত একমাত্র দোয়ার দ্বারাই দাজ্জাল ও ইয়া'জূজ-মা'জূজের ফেৎনা থেকে বাঁচবে বলে আমাদের প্রিয় নবী মহানবী (সঃ) বলে গেছেন। ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক জীবনে দোয়ার ফলও আমরা গত শতাধিক বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আসুন আমরা মসীহ (আঃ)-এর জামাতের লোকেরা সর্বদা নিষ্ঠার সাথে দোয়ায় ব্রতী থাকি।

যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দোয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন– "দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্তাআলা অধিক শক্তি রেখেছেন। খোদাতাআলা ইলহামের মাধ্যমে বার বার আমাকে অবহিত করেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। *দোয়া ব্যতিরেকে আর কোন হাতিয়ার আমাদেরকে দেয়া হয় নি।*"

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ ভয়বহ বন্যার করাল গ্রাসে আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঐশী জামাত বিধায় আমরা একদিকে যেমন দেশ ও দেশবাসীর জন্যে দোয়া করে যাচ্ছি তেমনিভাবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সামর্থ্য অনুযায়ী রিলিফ কার্য চালিয়ে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে জামাতের সকলকে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্ত মানবতার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

১৬ ভাদ্র ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ❑ ৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪১৯ হিঃ কাঃ
৩১ যহুর ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ৩১ আগস্ট ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

ইস্তেগফার

'ইস্তেগ্‌ফার' এসেছে 'গাফরুন' শব্দ থেকে, অর্থ ঢেকে দেয়া। সুতরাং 'ইস্তেগফার' অর্থ এই কামনা করা যেন ঢেকে দেয়া হয় বা চেপে দেয়া হয়। একটা গাছের শিকড় মাটির যত গভীরে প্রবেশ করে গাছটি ততই সরস-সজীব এবং দীর্ঘজীবী হয়। অপরপক্ষে একটা গাছকে যদি মাটির ওপরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে গাছটা মাটি থেকে রস সংগ্রহ করতে না পেরে শুকোতে থাকে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে। তাই তাগুতী শক্তিসমূহকে অস্বীকার করার পর ঈমানী শক্তি-রূপ অটুট হুড়কার সাথে সংযোগ স্থাপনের পরও উহাকে চির অটুট করার জন্যে এবং চির মসৃণ রাখার জন্যে যে জিনিসটির বিশেষ প্রয়োজন তা হলো 'ইস্তেগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইস্তেগফার পাঠের গুরুত্ব সম্বন্ধে কুরআন এবং হাদীসে বহু তাগিদ এসেছে। এর দু'একটি নিম্নরূপ –

(১) এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর – (সূরা হুদ : ৪ আয়াত)।

(২) "হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার" – (সূরা নূর : ৩২ আয়াত)।

(৩) "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর – খাঁটি তওবাঃ – (সূরা আত্‌তাহরীম : ৯ আয়াত)।

(৪) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযূর (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ আমার সাক্ষী যে, আমি তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দিনে তাঁর নিকট সত্তর বার তওবা করি – (সহী বুখারী)।

মু'মিনের প্রত্যেক উন্নতির ধাপ থেকে তার নীচের ধাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তার মধ্যে অনেক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ঐ নতুন অবস্থা সৃষ্টির পরই সে তা কেবল উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তার প্রতিটি যোগ্যতার সাথে পাশাপাশি চলে স্বভাবজ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা। তাই মু'মিনকে সর্বদা মাগফেরাতের চাদরে ঢেকে দেবার জন্যে তার প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করে তার ছোট খাট দুর্বলতাসমূহ, যা সে তার অনিচ্ছায় অগোচরে করে ফেলে বা ঐসব দুর্বলতা যে সম্বন্ধে সে অবহিতই নয়, ঢেকে দেন। আঁ হযরত (সঃ) ছিলেন মাসুম – নিষ্পাপ। তিনি দিনে সত্তর বার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এর কারণ কি ? এর প্রথম কারণ এই যে, তিনি নিজ জীবনের আদর্শ দ্বারা ইহা তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি মানব বিধায় মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁর কাজের মধ্যে যে কমতি থেকে যেত সেজন্যেও তিনি ইস্তেগফার করেছেন।

কতই না সুন্দরভাবে হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে ইস্তেগফারের কল্যাণ শিখিয়েছেন সূরা নূহের ১১-১৩ আয়াতে। উক্ত আয়াতে করীমা পাঠ করলে ইস্তেগফারের সুফল সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। ইস্তেগফার পাঠে খরার অবস্থা দূরীভূত করে আল্লাহ্‌তাআলা বর্ষণশীল মেঘ প্রেরণ করে থাকেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির নেয়ামত দান করেন এবং নদ-নদী বিধৌত বাগ-বাগিচা দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করে থাকেন। বন্যার প্রকোপ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকেও রক্ষা করতে পারেন।

মু'মিনের ব্যক্তি ও সামগ্রিক জীবনে যখন বিজয়ের অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন আনন্দ-অহমিকার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে কিছু দুর্বলতাও প্রবেশ করে যা কখনও কখনও তার দৃষ্টিতে আসে না। সেজন্যে কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন, যখন কোন বিজয় বা আনন্দের অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন যেন বেশী বেশী ইস্তেগফার পাঠ করা হয়। শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর আহ্‌মদীয়তের ইতিহাসে স্বল্প পরিসরে হলেও বিজয়ের হাতছানি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের বেশী বেশী ইস্তেগফার পাঠ করার আবশ্যকতা রয়েছে। আমাদের প্রিয় ইমাম আহ্‌মদীয়তের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কয়টি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মধ্যে বেশী বেশী ইস্তেগফার পাঠ করাও একটি। আসুন আমরা আমাদের প্রাণ-প্রিয় ইমামের আদেশ পালন করে ইস্তেগফার পাঠ করি – আস্তাগফিরুল্লাহে রব্বি মিন কুল্লি জামবিওঁ ওয়াতুবু ইলায়হে। (হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক, আমি সমুদয় পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি।) আমীন।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ হীনমন্যতা	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ স্থিরতা দ্বারাই খোদা লাভ হয় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ– আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
❑ ইউ. কে. সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ : হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫-১১
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	১২
❑ জুমুআর খুতবাঃ সৎসঙ্গের প্রবল আকর্ষণী ক্ষমতা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৩-১৮
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূল– হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ,	ঃ অনুবাদ– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৯-২০
❑ জুমুআর খুতবাঃ ইসলামী আতিথেয়তা ও শিষ্টাচার হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা সালেহ আহমদ	২১-২৬
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত মূল– আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী খলীফাতুল মসীহ সানী, আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)	ঃ অনুবাদ– এ. এইচ. এম. আলী আনোয়ার (মরহুম)	২৭-২৮
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৯-৩০
❑ বাইবেলের শিক্ষা ও খৃষ্টানদের বিশ্বাস	ঃ জনাব খন্দকার আজমল হক	৩১-৩২
❑ ছোটদের পাতাঃ রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের, লন্ডন	ঃ পরিচালক– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৩-৩৬
❑ হোমিওপ্যাথি– সদৃশ বিধান চিকিৎসা মূল : হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৩৭
❑ সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার সচিত্র প্রতিবেদন	ঃ আহমদী প্রতিবেদক	৩৮-৩৯
❑ সংবাদ	ঃ	৪০

প্রচ্ছদ : বাংলাদেশের বন্যা কবলিত কতিপয় এলাকা ও আর্ত মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবৃন্দ।

দুনিয়াব্যাপী একদিকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-ভূমিকম্প অপরদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি : এ কিসের আলামত!

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন,

"আমরা (সতর্ক করিবার জন্য) রসূল প্রেরণ না করিয়া কখনও শাস্তি অবতীর্ণ করি না" *(সূরা বনী ইসরাঈল, ২য় রুকূ)*।

এমন কোন শহর ও জনপদ নাই, যাহা আমরা কেয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করিব না, অথবা উহাকে গুরুতর শাস্তি দিব না" *(সূরা বনী ইসরাঈল, ৬ষ্ঠ রুকূ)*।

যুগ–নূহ বলেন,

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন"। *[ইলহাম-হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)]*

"হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

কুরআন মজীদ

সূরা মায়েদা—৫

৩০। আমি অবশ্য চাহি[৭৩৭] যে, তুমি আমার পাপ[৭৩৮] এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এইভাবে তুমি আগুনের অধিবাসী হও, আর ইহাই যালেমদের প্রতিফল।'

৩১। অতঃপর, তাহার (দুষ্ট) চিত্ত তাহাকে তাহার ভাইকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত করিল; অতএব, সে তাহার ভাইকে হত্যা করিল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৩২। তখন আল্লাহ্ একটি কাক প্রেরণ করিলেন, সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল[৭৩৯] যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কীভাবে সে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দেয়। সে বলিল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ ঢাকিয়া দিই? অতঃপর সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৩৩। এই কারণে আমরা বনী ইস্‌রাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে– কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল, যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে বাঁচাইল।[৭৪০] এবং আমাদের রসূলগণ অবশ্যই তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, তথাপি ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেক লোকই দেশে বাড়াবাড়ি করে।

৩৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার জোর প্রচেষ্টা চালায় তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতা-মূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।[৭৪১] ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা, আর পরকালেও তাহাদের জন্য মহাশাস্তি (অবধারিত) রয়িয়াছে;

৩৫। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তাহাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করিবে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।[৭৪২] (৫ম রুকূ)

৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায়[৭৪৩] অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

৭৩৭। 'উরিদু' (আমি চাই) রা-দা হইতে উৎপন্ন। এই শব্দটি অনেক সময় প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ না বুঝাইয়া, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনীয় বিষয়ের অবতারণাকে বুঝাইয়া থাকে (১৮ঃ৭৮)। এই আয়াতের অর্থ ইহা নয় যে, হাবীল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহার ভাই কাবীল দোযখে নিক্ষিপ্ত হউক। হাবীল অবস্থানুযায়ী যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই যে, তাহার শান্তিময় মনোভঙ্গী ও প্রতিশোধ-পরাঙ্মুখতার স্বাভাবিক পরিণতি ইহাই হইবে যে, তাহার ভাই হিংস্রতার জন্য দোযখে যাইবে।

৭৩৮। 'ইস্‌মী' অর্থ "আমার প্রতি অত্যাচার করা পাপ" ভাবী-হত্যার শিকার হাবীল, কাবীলের ভ্রাতৃহত্যার বাসনার কুফল কি হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৭৩৯। দাঁড়কাকের ঘটনা সত্যি ঘটিয়াছিল কিনা অথবা ইহা একটি উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান মাত্র, এই নিয়া তফ্‌সীরকারকগণের মাঝে মতভেদ আছে। ইহা একেবারে অসম্ভবও নয় যে, এইরূপ বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল। পাখীদের আচরণ ও অভ্যাস পাঠে এরূপ ধরনের তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে (আদিপুস্তক-৪ঃ১-১৫ এবং 'দি জেরুসালেম তরগুম' দেখুন)।

৭৪০। এই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, আদম (আঃ)-এর দুই পুত্রের ঘটনার মত একটি ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটিবার উপক্রম হইবে। তবে, পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার চাইতে বহুগুণ তাৎপর্যপূর্ণ হইবে। ইস্‌রাঈলীদের ভ্রাতৃবংশে একজন নবী আসার কথা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। এই সত্যটি ইসরাঈলীদের সহ্য হইবার কথা নয়, তাহারা ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার রক্ত ঝরাইবে, যেমন কাবীল তাহার ভ্রাতা হাবীলের রক্ত ঝরাইয়াছিল। কিন্তু ঐ নবীতো সাধারণ আত্মার মানব নহেন বিশ্ব-সংস্কারের জন্য তাঁহার আগমন নির্ধারিত ছিল যাঁহার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিশ্ব-মানবের জন্য চিরস্থায়ী বিধি-বিধান আসা অবধারিত ছিল এবং যাঁহার উপর মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জড়িত থাকার কথাও লিপিবদ্ধ। কাজেই তাঁহাকে হত্যা করার অর্থ দাঁড়াইতো বিশ্বের সফল মানুষকে যেন হত্যা করা এবং তাঁহাকে সংরক্ষণ করার অর্থ দাঁড়াইতো বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে সংরক্ষণ করা।

৭৪১। রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজনে, বিপজ্জনক সর্বনাশা দুষ্কৃতকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানে ইসলাম ইতস্ততঃ করে না। স্বপ্নবিলাসীগণের আবেগ- উচ্ছ্বাস ইত্যাদির তোয়াক্কা না করিয়া, যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি অনুসরণ করতঃ ইসলাম রাষ্ট্রের বা জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধকারীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এখানে চারি প্রকারের শাস্তির কথা উল্লেখিত হইয়াছে, কোন্ স্থলে কোন্ শাস্তি প্রযোজ্য হইবে, তাহা অপরাধ সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। শাস্তি-ঘোষণা ও বাস্তবায়ন সরকারের দায়িত্ব, কোন ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নহে। ইমাম আবূ হানিফার মতে, "দেশান্তর করণের' তাৎপর্য কারাদণ্ড।

৭৪২। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ চোর-ডাকাতের কথা বলা হয় নাই। বরং বিদ্রোহী যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, যাহারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এইরূপ কর্মতৎপরতা চালায় তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে"–বাক্যাংশটি উপরোক্ত অর্থ সমর্থন করে। এই অর্থই যে ঠিক, তাহা এই কথা হইতেও বুঝা যায় যে, অপরাধীরা অনুশোচনা করিলে, তাহাদিগকে ক্ষমাও করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য ও হিংসাত্মক অপরাধ করে, স্বাভাবিকভাবেই, রাষ্ট্র তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে না, তাহারা অনুশোচনা করিলেও না। আইন-সম্মত শাস্তি তাহাদিগকে ভুগিতেই হইবে। অবশ্য অনুশোচনা আল্লাহ্‌র ক্ষমা আকর্ষণ করে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীগণকে, অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে কোনও ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ না করার অঙ্গীকার সাপেক্ষে ক্ষমা করা যাইতে পারে।

৭৪৩। 'উসিলা'র অর্থ, কোন কিছুতে পৌঁছাইবার উপায়, বাদ্‌শাহের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন পদ, উপাধি, একাত্মতা, নৈকট্য, সংযোগ বা বন্ধন (লেইন)– শব্দটির অর্থ "আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী" নহে। কারণ, আরবী ভাষা, ব্যবহারিক দিক হইতে এই অর্থ মোটেই সমর্থন করে না। তাহা ছাড়া, "মধ্যস্থতাকারী আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে"–এই ধারণাটাই কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। ইহা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীসেরও পরিপন্থী। আযান দেওয়ার পর সাধারণতঃ যে দোয়া পাঠ করা হয়, তাহাতে আছে, "হে আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সঃ)-কে উসিলা দান কর"। ইহার অর্থ, আল্লাহ্‌তাআলা যেন নবী করীম (সঃ)-কে অধিক হইতে অধিকতর নৈকট্য ক্রমাগতভাবে দান করিতে থাকেন। ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইতে পারে না যে, আল্লাহ্ যেন তাঁহার ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী দান করেন।

হাদীস শরীফ

প্রতারণা

কুরআন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে (সূরা আর রা'দ : ১২)।

হাদীস : আন আবি হুরায়রাতা ক্বলা আন্না রসূলাল্লাহে (সঃ) ক্বলা ইযা ক্বলার্ রসূলু হালাকান্নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা ধ্বংস হয়ে গেল বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লাম এর উপর পেশ দ্বারা পড়লে হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখা :

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে।

মানুষের মাঝে উন্নতির জন্যে সবকিছু রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ উহার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার অহমিকায় ভোগে, তো কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে নিহিত থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠি উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে যদি চেষ্টা না করে বলতে থাকা যে, ধ্বংস হয়ে গেল– অত্যন্ত হতাশার বহির্প্রকাশ করে। আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেন, এভাবে বল্লে তারা নিরুৎসাহিত হবে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সঃ) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান হতে পরাস্ত হয়ে মদীনা ফেরৎ আসলেন। ইসলামে পলায়ন করা হারাম আর আমরা পলায়ন করেছি তারা এই ভেবে লজ্জায় ও শরমে হুযুর (সঃ)-এর সামনে আসতেন না। এক সময়ে হুযুর (সঃ) তাদের মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযুর (সঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা লজ্জায় মাথা নিচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সঃ) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছনে এসেছো। তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও নি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদিগকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্ কতই না উত্তম আচরণ ও কতই না উত্তম শিক্ষা! তিনি (সঃ) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর মন্তব্য করলেন!

আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আমরা কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি ও কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআন ও হাদীস বলে, এরূপ ব্যাধিগ্রস্তগণ কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সর্বদা সতেজ মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যু বরণ না করি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখা- **মাওলানা সালেহ আহমদ**
সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

স্থিরতা দ্বারাই খোদা লাভ হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

ইস্তিকামত ফওকাল কেরামাতে

"ইহা সত্য কথা যে, ইস্তেকামত বা স্থিরতার স্থান কেরামতের বা অলৌকিকত্বের উর্ধ্বে। পরম ও পূর্ণাঙ্গ স্থিরতা ইহাকে বলা হয়, যখন মানুষ নিজেকে চতুর্দিক থেকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদরাশি পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখে এবং খোদার পথে জীবন, সম্ভ্রম, সম্মান বিপদোন্মুখ হয়ে পড়ে এবং স্বস্তি ও যন্ত্রণাদায়ক কোন পথ অবশিষ্ট না থাকে এমন কি খোদাতাআলাও পরীক্ষাস্বরূপ স্বস্তি ও সান্ত্বনাদায়ক রো'য়া বা কশ্ফ অথবা ইলহাম বন্ধ করে দেন, বরং ভয়াবহ বৈরী শক্তিসমূহের মধ্যে ফেলে রাখেন, সেই সময়েও যেন সে কাপুরুষতা না প্রদর্শন করে, কাপুরুষের ন্যায় পিছনে না সরে যায় এবং বিশ্বস্ততার মহৎ গুণকে ক্ষুণ্ন হতে না দেয়। সত্যতা ও স্থিতিশীলতায় কোন ব্যাঘাত না সৃষ্টি হতে দেয়, লাঞ্ছনায় সন্তুষ্ট থাকে, মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত থাকে এবং "যা ইচ্ছা তা-ই হোক, কোন ভ্রুক্ষেপ নেই" – বলে মাথা পেতে দেয় এবং বিধাতার অমোঘ বিধানের সামনে উচ্চবাচ্য করে না এবং কোনক্রমেই অস্থিরতা ও অভিযোগ মুখে উচ্চারণ করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষায় পূর্ণতা লাভ হয় ও ইহার দায়-দায়িত্ব পালিত হয়। ইহাই সেই ইস্তিকামত ও স্থিরতা যদ্বারা খোদা লাভ হয়ে থাকে। ইহাই সেই বিষয় যার সুঘ্রাণ রসূল, নবী, সিদ্দীক এবং শহীদগণের মৃত্তিকা হতে এখনো ছড়িয়ে পড়ছে (রূহানী খাযায়েন ১০ খঃ)।

অনুবাদ -**আলহাজ্জ আবদুল আযীয সাদেক**

"হে আহমদী যুবকগণ! ওঠ। কেননা, তোমাদের সাথে আজ দুনিয়ার ভাগ্য সম্পৃক্ত। তোমাদের জীবন প্রদায়িনী গান গেতে হবে। দুনিয়াকে জীবিত করতে হবে। আল্লাহ্তাআলা ও রসূল (সঃ)-এর ভালবাসাকে বিলাতে থাক এবং ছড়িয়ে পড়। দুনিয়ার বিজয় আর সাহায্য তোমাদের পদ-চুম্বন করবে। কেননা, খোদার ইহাই নিয়তি যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এ নিয়তিকে পরিবর্তন করতে পারে দুনিয়াতে এমন কেউ নেই"।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

জলসার ভাষণ

ইউ. কে. সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ

সালানা জলসা ও ১৯৯৮ সনটির তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন দিক

[সৈয়্যদনা-হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ইউ. কে. জামাতের ৩৩ তম সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ, ৩১ শে জুলাই, ১৯৯৮ ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ১০৫তম আয়াত তেলাওয়াত ক'রে এর সরল অনুবাদ বর্ণনা করেন : "এবং তোমাদের মাঝে এমন এক জামাত থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দেবে এবং অসঙ্গত কাজ হতে নিষেধ করবে; বস্তুতঃ এরাই সফলকাম হবে।"

আজ আল্লাহ্তাআলার ফযলে ইউ. কে. সালানা জলসা–যদিও এই বলে ইহা অভিহিত, কিন্তু কার্যতঃ সমগ্র বিশ্বের (সকল জামাতের) প্রতিনিধিত্বে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর সূচনা প্রকৃতপক্ষে (কিছুক্ষণ পূর্বে অনুষ্ঠিত) জুমুআর খুতবার দ্বারাই হয়েছিল। কিন্তু যেভাবে ঐতিহ্যগত রীতি চলে আসছে তদনুযায়ী একটি উদ্বোধনী ভাষণ জুমুআর পরেও হয়ে থাকে।

সর্বপ্রথম তো আমি আপনাদের সামনে আযীমুশ্বান এই সংবাদ পেশ করছি যে, আজ আল্লাহ্তাআলার ফযলে এই জলসার উপস্থিতি-সংখ্যা এখন পর্যন্ত ১৪,৪০৬-এ পৌঁছেছে, যেখানে বিগত বছর এই সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত হাজার। অতএব, আল্লাহ্র ফযলে উদ্বোধনী অধিবেশনের শুরুতেই বিগত বছরে এই অধিবেশনের সর্বাধিক উপস্থিতির সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; অথচ এখনও অতিথিদের আগমন ধারা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্তাআলাই ভালো জানেন, এ জলসায় উপস্থিতি-সংখ্যা কী পরিমাণ বাড়বে। তবে আমি এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্র পবিত্র বান্দাদের দ্বারা যেন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। ঐ সকল পাক বান্দাদের দ্বারা, যাদের ওপর আল্লাহ্র প্রীতিভরা দৃষ্টি পড়ে। এরপর, এখন আমি যথারীতি উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করতে চাই।

যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি এরই সম্পর্কসূত্রে কয়েকটি হাদীস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। "আন আবি যাররিন ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা, তাবাস্সুমুকা ফি ওয়াজ্হে আখীকা সদাকাতুন ওয়া আম্রুকা বিল মা'রূফে ওয়া নাহ্ইউকা আনিল মুনকারে সদাকাতুন ওয়া ইরশাদুকার্ রাজুলা ফি আরযিয্ যালালে লাকা সদাকাতুন ওয়া বাসারুকা লিরাজুলিন রদ্দিয়েল বাসারে লাকা সদাকাতুন ওয়া ইমাতাতুকাল হাজারা ওয়াশ্ শাওকা ওয়াল্ আয্মা আনিত্ ত্বরীকে লাকা সদাকাতুন ওয়া ইফ্রাউকা মিন দাল্ওয়েকা ফি দাল্ওয়ে আখীকা লাকা সদাকাতুন।" এ হাদীসটি তিরমিযীর 'আবওয়াবুল বির্রে ওয়াস্সিলাহ্' থেকে গৃহীত। অর্থাৎ "হযরত আবু যর গফ্ফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাক্ষাতে তোমার স্মিত হাসি তোমার জন্য সদ্কা তথা পুণ্যস্বরূপ। তেমনি সৎকাজের আহ্বান ও অসঙ্গত কাজ হতে বারণ করা তোমার জন্য পুণ্যস্বরূপ, পথহারা কোন ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া তোমার জন্যে পুণ্যস্বরূপ, কোন অন্ধের হাত ধরে পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া তোমার জন্য পুণ্যস্বরূপ, পথ থেকে কষ্টদায়ক পাথর, কাঁটা বা হাড়-গোর দূর করা তোমার জন্য সদ্কাস্বরূপ এবং তোমার প্রাপ্য বা ন্যায্য অধিকার হ'তে কিছু তোমার ভাইকে দান করা তোমার জন্য সদ্কাস্বরূপ।" এ হাদীসটি শ্রবণের পর এই উদ্বোধনী ভাষণের সম্পূর্ণ বিষয়-বস্তুই আপনাদের বোধগম্য (ও হৃদয়ঙ্গম) হওয়া উচিত। আপনারা এখন এরূপ একটি জলসায় উপস্থিত হয়েছেন যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং তদনুযায়ী আল্লাহ্র খাতিরেই আপনাদেরকে নিজেদের আচরণ-ভঙ্গীর রূপায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সে-দিক থেকে স্মরণ রাখবেন, চলার পথে সর্বত্র যেন আপনারা উৎফুল্লতা ছড়িয়ে দেন, সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেন। তেমনি এরূপ ভাইদের পথ প্রদর্শন করুন, যারা কোন জায়গা বা ঠিকানার সন্ধানে আছেন। যদি খোদা তওফীক (সুযোগ-সামর্থ্য) দেন তাহলে তাদের মাঝে, যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিন। তেমনি, নিজের ভাইদের প্রতি বিনম্র ও সহানুভূতিশীল থাকুন এবং তাদের উপর স্নেহ ও প্রীতিভরা দৃষ্টি রাখুন, আর চলার পথে কোন কষ্টদায়ক জিনিস থাকলে তা অপসারণ করুন। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বেও আমি লন্ডনে প্রদত্ত খুতবায় নির্দেশনা দিয়েছিলাম যে, মানুষের ক্ষতির কারণ ওরূপ প্রত্যেকটি জিনিস দূর করতে সচেষ্ট হোন। অনেকে কলা খেয়ে পথে ছিল্কা ফেলে দেয়, অথবা হাড্ডি বা অন্য চোখা জিনিস যেখানেই আপনারা দেখতে পান তা উঠিয়ে নিন, আর এ প্রসঙ্গে আমি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছিলাম– তা আমি সবিস্তারে এজন্য পুনর্ব্যক্ত করছি যে, আগের খুতবাটি (সফররত) আগন্তুকগণ শুনতে পারেন নি। তা এই যে, প্রত্যেকে প্লাস্টিকের একটা থলে নিজ নিজ পকেটে রাখবেন। আর ব্যবস্থাপনার নিকট আমি প্রত্যাশা করছি, তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণ থলে কোথাও এভাবে রাখবেন যাতে সবাই জানতে পারেন যে, সেখান থেকে তারা বিনা পয়সায় থলে পেতে পারেন। সুতরাং সে থলেটি পকেটে রেখে দিন–খুবই হাল্কা ধরনের জিনিস। যেখানেই কোন ক্ষতিকর জিনিস দেখতে পান তা ঐ থলেটিতে পূরে নিন। তবে ওরূপ সব কিছু বাঁ হাত দিয়ে উঠাবেন। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী কোন রদ্দি জিনিস ডান হাতে ধরা উচিত নয়। পরে গিয়ে, যেমন কিনা আপনার কাছে এটাই প্রত্যাশা যে, নিজের হাত ভালভাবে ধুয়ে নেবেন। কিন্তু এ বিষয়টির অপর একটি ফল নির্ণীত হয় এই যে, আপনি যখন অন্যের কষ্টদায়ক জিনিস তোলেন তখন আপনার দিক থেকে অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে ওরূপ কোন জিনিস আপনি নিজেও (পথে যথাতথা) ফেলবেন না। তেমনিভাবে, রাস্তা–ঘাটে হৈ-চৈ বা উঁচু শব্দ করা, অথবা বাজারে এরূপে ঘোরা-ফেরা করা বা দোকান-পাটের সামনে এভাবে ভীড় জমানো, যা সর্বসাধারণের জন্য কষ্টের কারণ হয়, মানুষের কাছে দৃষ্টিকটু ঠেকে বা তাদের তা শুনতে খারাপ লাগে ও-রকম সবকিছু পরিহার করে চলুন। পর্যবেক্ষণকারীদের দৃষ্টি আপনাদের কিন্তু লক্ষ্য করছে। তাদের অনেকে দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসে সমবেত হয়েছেন আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের জলসায় কীরূপ চিত্র বা দৃশ্য উদ্ভাসিত হয় তা দেখার উদ্দেশ্যে। এ রকম বিশাল জনসমাগমের মাঝে তাদের নিয়ম-শৃঙখলা বজায় থাকে কিনা? সমস্ত দুনিয়ার মঙ্গল ও কল্যাণার্থে যে শিক্ষা তারা প্রচার করে থাকে, তা বাস্তবতঃ ওরূপই এবং তারা নিজেরা সাধ্যমত কার্যতঃ ঐ শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করে দেখায় কিনা? অতএব, কিছু লোক তা স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে এসেছেন।

এমনও কিছু লোক আছেন, যারা অবলীলায় আপনাদেরকে দেখতে পাবে এবং তাদের ওপর জলসায় আপনাদের ভূমিকার কোনও না কোন প্রভাব পড়বে। কাজেই আমি আশা রাখি যে, আপনারা সযত্নে উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

"নিজের ভাইকে কিছু দিয়ে দেওয়া তোমার জন্য পুণ্যস্বরূপ" (উক্ত হাদীসে বর্ণিত এ নির্দেশটির প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,) এখানে (–এ জলসায়) আগন্তুকদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র ফযলে এমন যে, তারা পার্থিব আকারে কোন সদ্‌কার মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু "ভাইকে কিছু দান করা" এ অর্থে যে, আপনি তাকে ভাল কথা বলেন তা অবশ্যই সদকা বটে। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ) ভাল কথাকেও এমন দান বলেই আখ্যায়িত করেছেন যেমন কেউ তার ভাইকে আসলেই কিছু দিল। অতএব, এ সকল গভীর-তত্ত্ব থেকে যে সার-কথা আমি আহরণ করেছি তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। এ সমস্ত উপদেশই আগন্তুক ও স্বাগতিক উভয়ের উদ্দেশ্যে বটে–তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

নামাযকে আপনারা যথাবিহিত ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করুন। কেননা, নামায ধর্মের প্রাণস্বরূপ। আজ জুমুআর খুতবায় আপনারা শুনেছেন যে, নামায হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দু, যার ওপর ইসলামের সার্বিক সৌধ নির্মিত হয়েছে। কাজেই নামায প্রতিষ্ঠায় সুব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং ভালো কথা উচ্চারণের ক্ষেত্রে নামাযের দিকে অপরের মনোযোগ আকৃষ্ট করার বিষয়টিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করুন। আমি চাই যে, এবার বাজামাত নামায চলাকালে চারদিক কোথাও যেন দল বেঁধে অহেতুক ঘোরাফেরা করতে কাউকে দেখা না যায়। যারা বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিয়োজিত, তাদেরকে পূর্বেও আমি বিশদ নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারাও তওফীক (সুযোগ-সামর্থ্য) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করবেন অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা যখনই তাদেরকে নামাযের জন্য কর্মবিরতির নির্দেশ দেন, তারা পালাক্রমে তাদের কর্মস্থলে বাজামাত নামায আদায়ে যত্নবান হবেন।

যদি দেখেন যে, বাজামাত নামায আদায়ের সুযোগ ও সময় পাওয়া যাচ্ছে না–যেমন অন্য কেউ একত্র হতে পারছেন না, তাহলে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুবিধা ও অবকাশবিধি পালন সংক্রান্ত ঐ হাদীস অনুযায়ী নিজের ইমামতিতেই নামায আদায় করুন। এ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, 'তোমার সঙ্গে বাজামাত আদায়কারী অন্য কেউ যদি না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশ্‌তাদের পাঠাবেন, যারা তোমার ইমামতিতে নামায আদায় করবে। এমনি ধারায় নামায বাজামাত আদায়ের কারণ হবে। এতদ্ব্যতীত, যিক্‌রে-এলাহীর দিকে সবিশেষ মনোযোগী হোন। যিক্‌রে-ইলাহী অন্য সব বিষয় অপেক্ষা শ্রেয়, যা কেবল নামাযেই নয়, বরং নামাযের পরেও অব্যাহত থাকে। অতএব আপনারা যদি নিজেদের অন্তঃকরণকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এর দ্বারা সুসজ্জিত করেন, তাহলে স্বভাবতঃ বৃথা কার্যকলাপের দিকে খেয়াল যেতেই পারে না। বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব যে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকা অবস্থায় মানুষ বেহুদা কথা-বার্তায়ও লিপ্ত হতে পারে। (কারও বেলায়) ওরূপ যদি ঘটে তাহলে এর অর্থ নির্ঘাৎ এই দাঁড়াবে যে, বৃথা কথা-বার্তা তার কাছে গুরুত্ব বহন করে এবং তার অন্তর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র যিক্‌রশূন্য। কেননা, প্রকৃত যিক্‌রে-ইলাহীতে মানুষের অন্তরে (আল্লাহ্‌র) পবিত্র বাণী জারি হয় এবং তাতে মানুষের জিহ্বার ওপরও আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাজারও জলসা চলাকালীন সময়ে বন্ধ থাকা উচিত। কঠোরভাবে তা কার্যকরী করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কর্তব্য, যাতে (সাধারণভাবে) বাজার বন্ধ থাকে। তবে বাধ্যকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অসুস্থদের এবং দেরীতে আসা মেহ্‌মানদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনে কিছু দোকান যদি খোলা রাখা হয়, তবে সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা উচিত যাতে স্থানীয় লোকজন, যাদের ন্যায্য কোনও প্রয়োজন নেই তাদের মধ্যে কেউ যেন এই সুযোগের অসদ্ব্যবহার না করতে পারে।

পরস্পর সালাম বলার রীতিকে বিস্তার দিন; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে যে, "আফশুস সালামা।" পরিচিত, অ-পরিচিত সবাইকে সালাম বলুন। এবং নিজ থেকে কাউকে সালাম বলার অর্থ হচ্ছে, 'আমার দিক থেকে তুমি নিরাপদ রয়েছ। আমার দিক থেকে তোমার কোন ক্ষতি হতে পারে না।' ইহা একটি দোয়াও বটে এবং নিশ্চয়তা প্রদানও যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ফযলের দ্বারা আমাদেরকে এমন জামাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, অতএব আমাদের দ্বারা কারও কোন ক্ষতি সংঘটিত হতে পারে না।

মাথার আচ্ছাদন কেবল মহিলাদের জন্যই নয়, বরং পুরুষদের জন্যও এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যকীয় যে, মাথায় আচ্ছাদন রাখার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং মাথায় টুপি পরিধান করে বাজারে অহেতুক ঘোরাফেরা করতে আপনারা খুব কম লোকই দেখতে পাবেন। ওরকম কেউ থাকলেও তা খুব বিরল। বস্তুতঃ মাথায় টুপি বা পাগড়ি পরার সাথে সাথে আমাদের মনে এই অনুভূতির উদয় হয় যে, আমাদের কাছে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রত্যাশা করা হচ্ছে। মহিলাগণকে আগেও আমি উপদেশ দিয়েছি যে, পর্দার দিকে খেয়াল রাখবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ইংল্যান্ডে প্রতিপালিত বহুসংখ্যক মেয়ে বহিরাগত মেয়েদের জন্যও আদর্শ বহন করে। যখন থেকে আমি নসীহত করেছি, খোদাতাআলার ফযলে মাথা ঢেকে রাখা এবং পর্দার সবদিক খেয়াল রেখে চলায় তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পাকিস্তান অথবা অন্যান্য দেশ থেকে আগত অনেকেই এই ব্যাপারে অসাবধানতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। চলার পথে, পুরুষদের এ কাজ নয়–তাদেরকে থামিয়ে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। কখনও ওরূপ করার অনুমতি নেই। তবে মহিলাদের পক্ষ থেকে এরূপ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা উচিত যারা সংযতভাবে নম্রতা, প্রীতি ও ভালবাসার পন্থায় ওরূপ মেয়েদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে, তারা এরূপ একটি জলসায় অংশগ্রহণ করছে, যা তাদের থেকে অনেক উঁচু আদর্শের প্রত্যাশা করে থাকে। আমি আশা করি, এর ফলশ্রুতিতে তাদের ভেতর পুণ্য পরিবর্তন প্রতিফলিত হবে। আর ঐ সকল মেয়েলোক যারা কোন কোন রোগবশতঃ পুরোপুরি মাথা ঢাকতে অপারগ– তাতে তাদের কষ্ট বেড়ে যায়, তাদের অবশ্য কর্তব্য তারা কখনও সাজসজ্জা করে বেরুবেন না। সরলতা অবলম্বন করুন। আর তাদের এই সরলতাই হবে তাদের জন্য পর্দাস্বরূপ।

পূর্বেও যেমন বলে এসেছি, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম এবং সমস্ত দুনিয়ার তুলনায় সবচে' স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে দান করেছেন। প্রত্যেক আহমদীর কাছেই প্রত্যাশা, সে যেন সজাগ দৃষ্টি রাখে চলাফেরার সময়ে এবং বসা অবস্থায়ও। অর্থাৎ সব সময় সতর্ক পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অবস্থান করেন।এবং যেখানেই এমন ধরনের কোন লোক তার চোখে পড়ে যার সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে, তার দিক থেকে নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর পক্ষে সম্ভব হলে রাস্তায় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকা এবং অবশ্যই নিরাপত্তা ব্যবস্থার লোক যারা কাছাকাছিই রয়েছেন তাদের কাছে তাকে সোপর্দ করে বলে দেওয়া কর্তব্য যে,

এই ব্যক্তির দিক থেকে আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু তাকে সরাসরি কোনও কিছু বলার তার আদৌ কোন অধিকার নেই। তাছাড়া, যখন সভাস্থলে বসেন, যেমন আপনারা এখন বসে আছেন, এমতাবস্থায় নিজেদের ডানে-বায়ে দৃষ্টি রাখুন–নির্ভরযোগ্য, কি অনির্ভরযোগ্য, পরিচিত কি অপরিচিত তাতে কিছু আসে যায় না। আপনারা নীতিগতভাবে সংগোপনে সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন–বিষয়টিকে আপনারা একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করুন। অধিকাংশ বিপদ এসে থাকে এরূপ লোকদের দিক থেকে, যাদেরকে নিঃশঙ্ক ভাবা হয়, যাদের সম্পর্কে তাদের পার্শ্ববর্তী বা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিযুক্ত লোকদের ধারণা হয়ে থাকে যে, এদের দ্বারা কোন বিপদ ঘটতেই পারে না। ওরূপ লোকই (কখনো কখনো) সংকটের কারণ হয়ে যায়। সেজন্য কুধারণার প্রশ্ন নয়, বরং সতর্কতার প্রশ্ন। কারও প্রতিই কুধারণা পোষণ করবেন না। তবে প্রত্যেকের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকুন। এই ক'টি সংক্ষিপ্ত কথা, যা আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার আমার ইচ্ছা ছিল।

এখন আমি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। এগুলোতে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে উপদেশাবলী দান করা হয়েছে এবং দোয়াও দেয়া হয়েছে। **তাছাড়া ১৮৯৮ ইং সালে অবতীর্ণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় এলহামও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। আগেও আমি এ গভীর তত্ত্বটির উল্লেখ করেছি যে, সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়েছে, যে-সব এল্হাম উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে অর্থাৎ ১৮৮০-এর পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রায় অনুরূপ ঘটনাবলী বিংশ শতাব্দীর শেষাংশেও পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।** এই ক্রমধারা বিশেষতঃ ১৯৮২ থেকে উপলব্ধি করি এবং বার বার আমি আমার বিভিন্ন ভাষণে জামাতের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছি যে, 'দেখুন! ১৮৮২ সালে এই এই এল্হাম হয়েছিল। তারপর ১৯৮২ সনে খোদাতাআলার ফযলে যখন এই খিলাফতকালের সূচনা হয় তখন এই সময়কালটির ওপর ঐ সমস্ত এলহাম প্রযুক্ত হচ্ছে।' **অতএব, ১৮৯৮ সালে যেসব এল্হাম অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোতে উল্লেখিত (বা নিহিত) সুসংবাদসমূহের দ্বারা আমরা কল্যাণমণ্ডিত হব। এবং আমি আশা রাখি, যেসব সংকট চিহ্নিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে যথাসাধ্য আমরা দোয়া করবো, আল্লাহ্তাআলা যেন সেগুলোকে টলিয়ে দেন।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯৮ সনে অবতীর্ণ এলহামসমূহ উল্লেখ করে বলেন, "খোদাতাআলার রহ্মত হতে নিরাশ হবে না। কেননা, খোদার রহমত পরীক্ষার এই দিনগুলোর পরে শীঘ্র অবতীর্ণ হবে। খোদার সাহায্য প্রত্যেক পথ দিয়ে আসবে। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তোমার নিকট উপস্থিত হবে।"

সুতরাং দেখুন, ১৯৯৮-এর এই জলসায় যে বিপুল সংখ্যায় (সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিতি ১৮ হাজারে উন্নীত হয়েছে– অনুবাদক) লোকজন এসেছেন তা আমাদের কল্পনায়ও ছিল না। সুতরাং এর জন্য আমাদের প্রস্তুতিও ছিল না। তবে সতর্কতা- মূলকভাবে আমরা খোদাতাআলার ফযলে সবসময়ই (অধিক লোকের আগমনের আশায়) অনেক বেশী পরিমাণেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকি। আর তা এই পরিস্থিতিতে কাজে আসে। তাছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত এল্হাম যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ যুগে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা হুবহু আজও পুরা হচ্ছে। সুতরাং তিনি লিখেছেনঃ "মানুষ দূর দূরান্ত থেকে তোমার নিকট উপস্থিত হবে। খোদাতাআলা নিদর্শন দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজ সান্নিধ্য হতে তোমার সাহায্য করবেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে নিদর্শন দেখাবেন। এবং ঐ সমস্ত লোকও সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমি স্বয়ং আসমান হতে ওহী নাযেল করবো, অর্থাৎ পরোক্ষভাবেও নিদর্শনাবলী দেখাবো।" এর পর প্রথমে আমি ১৮৯৮-এর পূর্বের ক'টি উপদেশমূলক উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই। পরে ১৯৯৮-এর এলহাম ও উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপন করবো। সূচনাকাল থেকেই সাধারণভাবে যে-সব উপদেশ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিয়ে এসেছেন এবং আপনাদের কাছে তিনি যে-সব প্রত্যাশা করেছেন উহার অংশবিশেষ এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেনঃ "স্বল্প সঙ্গতি (আয়) সম্পন্ন বন্ধুদের পক্ষে সমীচীন হবে, তারা যেন জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণে মনোযোগী হন। তারা যদি তদ্বির (সুপ্রচেষ্টা) এবং সাশ্রয় ও সঞ্চয়ের দ্বারা সফর খরচের জন্য প্রতিদিন অথবা প্রতিমাসে অর্থ সংস্থান করতে থাকেন এবং পৃথকভাবে তা সংরক্ষণ করতে থাকেন, তাহলে অনায়াসে সফর খরচের পাথেয় সহজলব্ধ হবে।" উক্ত বিষয়টি আমি এই জলসায় বিশেষভাবে অনুভব করলাম। সুতরাং সাক্ষাৎকারে কতক এরূপ ব্যক্তিদের সাথে দেখা হয় যাদের সম্পর্কে আমি আশা করছিলাম না যে, তারা সফর করার মত সঙ্গতি রাখেন। অনেকেই আছেন যাদেরকে তাদের জার্মানীতে বসবাসরত আত্মীয়রা ডেকে নেন, অথবা সুইজারল্যাণ্ড বা ইংল্যাণ্ডের আত্মীয়রা। কিন্তু উল্লেখিত ঐ ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম যে, বহির্দেশে থেকে কোন আত্মীয় তাদের কোনও সাহায্য করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার ফযলে টাকা-পয়সা সঞ্চয় করতে থাকেন। তারা বলেন যে, মাসে মাসে টাকা সঞ্চয়ের দরুন অবশেষে ফল দাঁড়াল এই যে, খোদাতাআলা তাদেরকে তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত জলসায় যোগদান করার তওফীক দান করলেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উল্লেখিত বাণীটি গভীর বরকত ও কল্যাণ বহন করে। কাজেই ভবিষ্যতেও লিল্লাহী সফরের উদ্দেশ্যে তদ্বির অবলম্বনেও যত্নবান থাকবেন। তদ্বির এটা নয় যে, ধনী আত্মীয়-স্বজনের কাছে হাত পাতেন। তদ্বির এটাই যে, আল্লাহ্ সমীপে হাত পাতেন এবং কিছু না কিছু টাকা সঞ্চয় করতে সচেষ্ট থাকেন। এ-ই সেই তদ্বির যা সবসময় আপনাদের কাজে আসবে।

ইহাও স্মরণ রাখবেন যে, খোদাতাআলার পথে যখন মানুষ অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা পরিহার করে এবং চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন, তখন আল্লাহ্তাআলা অবশ্যই তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকেন। অদৃশ্য হাতে তাকে সাহায্য করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বহু ঘটনার মধ্যে একটি এই যে, কানাডায় বসবাসকারী এক ভাই আব্দুল হাকীম সাহেবের ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন এবং শুনানী ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯৮ তারিখে সম্পন্ন হয়। তাঁকে জানানো হয় যে, সিদ্ধান্তের অবগতি আপনাকে ডাকযোগে পাঠান হবে। তিনি আমাকে দোয়ার জন্য ফ্যাক্স করেন এবং তাতেই যথেষ্ট বলে ক্ষান্ত হন। এ প্রসঙ্গে সাহায্যের জন্য জামাতি ব্যবস্থাপনার কাছে কোনও দরখাস্ত করেন নি। ইমিগ্রেশন অফিস থেকে ২২শে এপ্রিল তারিখের পাঠানো চিঠি পেলেন এই বলে যে, আপনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হলো। এই অবগতি উদ্বেগসৃষ্টির কারণ হলো। আপীলের জন্য এক মাসের সময়

দেওয়া হয়েছিল। এই পর্যায়ে একটি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হলো, "আপনি প্রতিদিন তবলীগ করেন। সেজন্য আপনি ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে বলুন, প্রত্যহ আপনার কাজ করে থাকি, আপনি ইমিগ্রেশনকে আমার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। বাহ্যতঃ এর অধিকারও প্রতীয়মান হচ্ছিল, যাতে আমীর সাহেবকে সেজন্য অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি মানুষকে প্রতিপালক-প্রভুর দিকে ডাকি–এই কাজটি আমীর সাহেবের ওপরে কোন এহ্সান নয়।' তখন সে প্রতিবেশী বল্লেন, 'দয়াময় আল্লাহ্ও আপনার কোন সাহায্য করেন নি।' তার ঐ কথাটি যেন আল্লাহ্র গয়রতের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল। তিনি তাকে বল্লেন, 'আমরা সাহায্যের জন্য আল্লাহ্কে ডেকে থাকি। অতএব, তাঁকেই ডাকবো এবং অবশ্য-অবশ্যই সফলকাম হবো।' তিনি লিখেছেন যে, দু'দিন পর্যন্ত দোয়া করতে থাকেন। তারপর ৪ঠা মে তারিখে তাঁর উকিল ফোন যোগে জানালেন যে, 'অফিসের ভুলের দরুন আপনাকে ভুল সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।' সুতরাং সেদিনই ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে সংশোধিত সিদ্ধান্ত তাঁর হস্তগত হলো এই বলে যে, 'আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো।' অতএব, এই হচ্ছে আল্লাহ্তাআলার ওপরে তওয়াক্কল (-ভরসা)-কারীদের তিনি কীভাবে সাহায্য করে থাকেন তার একটি বৃত্তান্ত। তবে, আগেও যেমন বর্ণনা করেছি যে, **স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্তে ভরসা এ অর্থে বা উদ্দেশ্যে কখনও করবেন না যে, আল্লাহ্ আবশ্যকীয়ভাবে সাহায্য করবেন। যখন ভরসা ঐ নিয়্যতে করবেন তখন ভরসার অবসান ঘটে যায়।** তারপর একপ্রকার সওদা (বা দরকষাকষি) শুরু হয়ে যায়। উল্লেখিত যে ভ্রাতার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করলেন, সে-ক্ষেত্রে তিনি কোন রকমেরই সওদা করেন নি। তিনি প্রত্যেক পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তার হৃদয়ের এই ফয়সালা ছিল যে, তিনি কোন মানুষের সামনে হাত পাতবেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাদিয়ানের সালানা জলসার দিকে আহবানমূলক একটি ইস্তেহারে বলেনঃ

'সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের সমীপে বিনীত নিবেদন এই যে, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯২ তারিখে কাদিয়ানে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হবে। এই জলসার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যেন প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সামনা-সামনি ধর্মীয় কল্যাণ লাভের সুযোগ ঘটে, আর তার ধর্মীয় আচরণ, অনুভূতি ও জ্ঞানের পরিধি যেন ঈমান ও মা'রেফত সমৃদ্ধ হয়। আর এ জলসার মাঝে এসব কল্যাণও নিহিত রয়েছে যে, সাক্ষাৎ লাভের দ্বারা যেন ভাইদের পরস্পর পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হয় এবং এই জামাতে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এতদ্ব্যতীত, এ জলসার অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্যাবলীল অন্যতম এই যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার ধর্মীয় সহানুভূতির জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবলী যেন উপস্থাপন করা হয়। কেননা, এখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।"

লক্ষ্য করুন, কোন্ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সব বিষয়ের প্রত্যাশা অভিব্যক্ত করেছিলেন! তাতে পরস্পরে বসে ঐ সব তদ্বির ও উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্যও হেদায়াত করা হয়েছে যাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় লোকদের যেহেতু ইসলামের দিকে আকর্ষণ ঘটছে সেহেতু তাদের জন্য আমাদের কী করা উচিত!

আরেকটি ইস্তেহারে তিনি (আঃ) বলেন, "পুনর্বার লেখা হচ্ছে যে, এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করবেন না। ইহা ঐ বিষয় যা সত্যের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তিপ্রস্তর খোদাতাআলা নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এজন্যে জাতি সমূহকে তৈরী করেছেন যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, ইহা ঐ সর্বশক্তিমান খোদার কাজ যার সামনে কোনও বিষয় অসম্ভব নয়।'

অতএব, আজ যে আপনারা জাতিসমূহের এদিকে আকর্ষণ দেখতে পাচ্ছেন তা ঐ সব ভবিষ্যদ্বাণীরই ফলশ্রুতি, যেগুলোর বাস্তবায়ন আল্লাহ্ অবধারিত করেছেন। কেননা, এগুলো তিনিই দান করেছেন। তিনি (আঃ) আরও বলেছিলেন, "তৃতীয় শাখা এই প্রতিষ্ঠানের ঐ অতিথিগণ এবং সত্যের অনুসন্ধানে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ যাঁরা এই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় সাক্ষাৎ করতে এসে থাকেন।" অতএব, তাঁর (আঃ) উক্ত কথাটিও দেখুন কীরূপ সত্য সাব্যস্ত হয়েছে! বহুল সংখ্যক আহ্মদী এবং অ-আহ্মদীও সাক্ষাৎ করার নিয়্যত করে চলে আসেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, "এ শাখাটিও অনবরতই বেড়ে চলেছে। যদিও মাঝে মাঝে কিছু কম হয়, কিন্তু কখনো কখনো খুব উদ্যমের সঙ্গে অতিথি সমাগম আরম্ভ হয়। ফলতঃ সাত বৎসরে ষাট হাজারেরও কিছু অধিক মেহ্মান আগমন করে থাকবেন।"

লক্ষ্য করুন, 'সাত বছরে ষাট হাজারেরও অধিক মেহ্মান এসে থাকবেন।' অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় আট হাজার সংখ্যা দাঁড়ায়। ঐ সময়ে কাদিয়ানে অতিথি-সেবার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে প্রতি বছর আট হাজার মেহ্মানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু এর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে পরিচালনা করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, "এই সকল অতিথিদেরকে বক্তৃতার সাহায্যে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ পৌছানো হয় ও তাদের সমস্যার সমাধান করা হয় এবং তাদের দুর্বলতা দূরীভূত করা হয়, তা খোদাতআলাই অবগত আছেন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মৌখিক বক্তৃতা যা প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে বা হয়ে থাকে, কিম্বা স্থান ও অবস্থা বিশেষে নিজ হতে যা-কিছু বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তা কোন কোন দিক দিয়ে পুস্তকাদি প্রকাশনার কার্যের তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণকর, ফলপ্রদ ও দ্রুত হৃদয়গ্রাহী প্রতিপন্ন হয়েছে।"

অতঃপর ঐ ইস্তেহারসমূহের মধ্যে একটিতে তিনি (আঃ) বলেনঃ "যে-সব ব্যক্তি এ 'লিল্লাহী' (ঐশী) জলসার জন্যে সফর করেন, আল্লাহ্ তাদের সাথী হোন, তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাদের ওপরে করুণা বর্ষণ করুন ও তাদের কষ্টসমূহ ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্যে সহজসাধ্য করে দিন এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করুন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পথসমূহ খুলে দিন আর আখেরাত দিবসে তাঁর ঐ সব বান্দাদের সাথে তাদেরকে উত্থিত করুন যাদের ওপরে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণাধারা বর্ষিত হয়েছে। এবং তাদের সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অবর্তমানে তিনি তাদের খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হোন।" খিলাফতের এই বিষয়-বস্তুটি বিস্ময়কর বটে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্তাআলার পবিত্র বান্দাদের পরে– তাদের অবর্তমানে তাদের খোদা-ই তাদের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। "হে খোদা! হে মহামর্যাদাবান, অসীম দাতা ও পরম দায়ময় খোদা এবং দুখ নিঃরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর, এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ওপরে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে

বিজয় দান করো। কেননা, সব শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন। বিনীত নিবেদক– মির্যা গোলাম আহমদ (কাদিয়ান)

এখন আমি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি এল্হাম (ঐশীবাণী) আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যা আজ থেকে একশ' বছর পূর্বে ১৮৯৮ সালে আল্লাহ্ তাঁর ওপরে নাযেল করেন, আপনারা দেখতে পাবেন, সেগুলো আজ এ যুগেও প্রতিফলনের দিক দিয়ে প্রযোজ্য হচ্ছে। যেমন, তিনি (আঃ) বলেনঃ

"ওয়া আওহা ইলাইয়া রব্বি ওয়া ওয়াদানী আন্নাহু সা-ইয়ান্সুরুনী হাত্তা ইয়াব্লুগা আম্রি মাশারিকাল্ আরযে ওয়া মাগরিবাহা ওয়া তাতামাউওয়াজু বুহুরুল হাক্কে হাত্তা ইউজিবান্ নাসা হুবাবু গাওয়ারিবিহা" (লুজ্জাতুন্ নূর, পৃঃ ৬৭)।

"আমার প্রতিপালক-প্রভু আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন এবং ওয়াদা করেন যে, তিনি আমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করবেন, এমন কি আমার বাণী পৃথিবীময় পূর্ব ও পশ্চিমে গিয়ে পৌছুবে। সত্যের নদ-নদী উদ্বেল ও উচ্ছল হয়ে ওঠবে, এমন কি এর তরঙ্গের উর্মিমালা মানবজাতিকে আশ্চর্যান্বিত করবে।"

'আল হাকাম' পত্রিকায় ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়, "হযরত আকদস ইমামুয্ যামান (সল্লামাহুর রহমান)-কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন যে, 'আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাবো।" আল্লাহ্তাআলার ফযলে আহ্মদীয়তের তবলীগ (প্রচার) পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌছে গেছে। এখন অনবরত এ প্রান্তসমূহ প্রসারিত হয়ে চলেছে। ইহাও ১৮৯৮ সালের ইল্হামসমূহের অন্যতম বরকত ও আশিস, যা আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করছি।

তিনি (আঃ) বলেন, "খোদাতাআলা আমাকে অবহিত করেছেন যে, বহু সংখ্যক লোক এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যদিও তারা এখনও জামাতের বাইরে আছেন, কিন্তু খোদার জ্ঞানে তারা জামাতের মাঝে শামিল রয়েছেন।"

সুতরাং অসংখ্য ওরূপ লোকদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যারা পাকিস্তানেও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বহির্বিশ্বে ও আরব জাহানেও সর্বত্র তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে– তারা অন্তর থেকে (হৃদয় দিয়ে) জামাতকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ জানেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উক্ত লেখা অনুযায়ী তাদের অন্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পুনর্জীবন ও পুনর্বাসনের এই ঐশী-আন্দোলনের প্রতি যে কী পরিমাণ ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন, বারংবার ঐ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে এই এল্হাম নাযেল হয়েছেঃ

"ইয়াখিররুনা সুজ্জাদান রব্বানাগ্ফির লানা ইন্না কুন্না খাতেঈন।" অর্থাৎ তারা সিজদাবনত হয়ে দোয়া করবে, হে আমাদের প্রভু আমাদের ক্ষমা কর। কেননা, আমরা ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম।"

১৮৯৮ সালে 'জরুরতুল ইমাম' পুস্তকে তিনি (আঃ) বলেন, "আল্লাহ আমাকে বার বার ইলহাম যোগে জানিয়েছেন যে, বর্তমান যুগে ঐশী জ্ঞান, ঐশী প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।" অর্থাৎ, বর্তমান সমগ্র এই যুগে আল্লাহ্তাআলা যে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দান করেছেন এবং যে ঐশীপ্রেম ও ভালোবাসা তাঁর অন্তরে উদ্বেলিত ছিল, সমস্ত জগৎ ব্যাপী তাঁর মত অন্য কোন ব্যক্তি এযুগে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৪ঠা জুলাই ১৮৯৮ ইং তারিখে এল্হামযোগে তাঁকে (আঃ) জানানো হয় যে, "বারাহীনে আহ্মদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ইলহাম যেখানে এ অধম সম্পর্কে আধ্যাত্মিক গুঢ় রহস্য ও ঐশী জ্ঞান-তত্ত্বরাজি সম্পর্কীয় পুরস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে আমাকে 'আহ্মদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "ইয়া আহ্মাদু ফাযাতির রাহ্মাতু আলা শাফাতাইকা" ('তোমার ওষ্ঠাধর যোগে রহ্মতধারা উৎসারিত হয়েছে')। আর যেখানে জাগতিক বরকত ও কল্যাণরাজির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে 'ঈসা' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন, বারাহীনে আহ্মদীয়ায় লিপিবদ্ধ আমার ওপরে অবতীর্ণ এল্হামে তিনি বলেছেন: 'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া মুতাহ্হেরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারু ওয়া জায়েলুল্লাযীনাত্ তাবাউকা ফওকানূল্লাযীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্"। (অর্থ ঃ "হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করবো–মর্যাদাবান করবো এবং অস্বীকারকারীদের সমস্ত অপবাদ থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করবো এবং তোমার মান্যকারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামতকালব্যাপী প্রাধান্য দান করবো"–অনুবাদক।) তেমনি সেই ইল্হামটি, যেখানে তিনি বলেছেন, "আমি তোমাকে অত্যন্ত বরকতমণ্ডিত করবো, এমনকি বাদশাহ্গণ তোমার বস্ত্রাদি থেকে বরকত ও কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" ইহা সেই গোপন-তত্ত্ব যে, জন্য আমাকে ইলহামযোগে ঈসা এবং মাহ্দী নামে অভিহিত করা হয়েছে।"

ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন-তত্ত্ব যা তিনি ইল্হামযোগে উন্মোচন করেছেন এই বলে যে, যেখানে মাহ্দীর বিজয়-সাফল্যসমূহের উল্লেখ রয়েছে সেখানে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে ঈসা নামে সুসংবাদসমূহ দান করা হয়েছে, সেখানে জাগতিকভাবে জামাত আহ্মদীয়াকে প্রাধান্য দানের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ এতদোভয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তাঁর পায়রবীর ও অনুসরণের দরুন কল্যাণমণ্ডিত হয়ে মাহ্দীর পদমর্যাদায় যে ইসলামের অসাধারণ খিদমত করেছেন এবং যা এখনও অব্যাহত রয়েছে, ইহা জাগতিক সাফল্যসমূহের মোকাবেলায় অনেক উঁচু মর্যাদা বহন করে।

তিনি (আঃ) উল্লেখ করেন যে, ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখে তাঁর ওপর ঐ ইলহামসমূহ নাযেল হয় যা এখন আমি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, আজ জুলাই-এরই সংলগ্ন দিন চলছে। সেজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উক্ত মাসের ৪ঠা তারিখের বিশেষভাবে উল্লেখের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত এই যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, এই দিনগুলোতেই তারা এই ইল্হামসমূহের বিষয়-বস্তু আবারও অনুরূপভাবে প্রতিফলিত হতে অবলোকন করবে। তখনও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ওপরে প্রাধান্য লাভ করে অগ্রসর হবে এবং আহ্মদীয়তের শত্রুদের উপরও বিজয় সাধিত হবে। ইল্হামযোগে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যা কিছু ইল্হামযোগে জানা গিয়েছিল, আগামী মৌসুম দৃশ্যতঃ ওরূপই হবে বলে প্রতীয়মান হয়। ঐ সংবাদও ভীতিপ্রদ ও আশঙ্কাজনক। ঐ দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন। **আমি তো (আল্লাহ্ কর্তৃক) ইহাই জ্ঞাত হয়েছি যে, ঐ দিনগুলো অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং মৃত্যু ও বড় ধরনের দুঃখ-কষ্টের দিন।"**

এখন লক্ষ্য করুন, হুবহু অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই দুনিয়াকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। **যে সব বড় বড় বিপদ ও আশঙ্কাবলী এ বৎসরটিতে প্রকাশ পাচ্ছে, ব্যাপকভাবে যে-সব ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে, যে-ভাবে বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবত অসংখ্য মানুষকে গ্রাস করে চলেছে–এ ধরনের বিপদসঙ্কুল বছর আপনারা**

পূর্বে কখনও দেখেছেন কিনা সন্দেহ। আমার তো স্মরণ পড়ে না। যা-কিছু এ বছর ঘটে চলেছে, বিশেষতঃ আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধাবাদীদের ক্ষেত্রে তা এক শিক্ষণীয় নিদর্শনস্বরূপ, যদি প্রত্যক্ষ করার মত চোখ থাকে।

তারপর, ১৮৯৮ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্লেগ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর ওপরে সদ্য অবতীর্ণ ইল্‌হামসমূহ বর্ণনা করেন ঃ

"আমি তাহাজ্জুদ নামাযে প্লেগের ব্যাপারে দোয়া করছিলাম। অতঃপর ইল্‌হাম (ঐশীবাণী) হলো, "ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়েরু মা বি-ক্বওমিন হাত্তা ইউগাইয়েরু মা বি-আন্‌ফুসিহিম।" (অর্থাৎ 'খোদা কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার সংশোধনমূলক পরিবর্তন ঘটায়– ঘটাবার চেষ্টা করে।') প্লেগ প্রসঙ্গেই ঐ কথাটি বলা হয়। আর **বহুবার আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছি যে, দুনিয়া জুড়ে এইড্‌স বলে যে রোগটি বিস্তার লাভ করেছে বিশেষতঃ এই শতাব্দীর শেষভাগে, ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহাম অনুযায়ী প্লেগেরই অপর একটি রূপ**। এবং হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও এই রোগটিকে অশ্লীলতার সঙ্গে জড়িত এবং এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে ইহাকে প্লেগস্বরূপই বর্ণনা করেছেন। অতএব, আমি মনে করি ১৮৯৮ সালের উক্ত এলহামটি প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকালের এইড্‌স-এর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত, যা মানবজাতির ঘাতক হিসাবে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মসীহ মাওউদ (আঃ) অতঃপর বলেন, "এখন প্রতীয়মান হয় যে, 'কে (একথা) বলতে পারে (যে,) হে বিদ্যুৎ! আকাশ হ'তে পতিত হোস না?' ইতঃপূর্বে অবতীর্ণ উক্ত ইল্‌হামটি হয়তো ঐ প্লেগের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত।" অর্থাৎ, আকাশের বিদ্যুৎ পতিত হওয়ার ফয়সালা যদি অবধারিতই হয়ে থাকে তাহলে স্মরণ রাখুন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে এই এলহামই হয়েছিল যে, "কে বলতে পারে, 'হে বিদ্যুৎ! আকাশ থেকে পতিত হবি না'। তিনি (আঃ) বলেন যে, এ ইল্‌হামটি যথাসম্ভব উক্ত প্লেগ তথা এইড্‌স সম্পর্কেই ছিল।

১৮৯৮ সালে ঐ ইল্‌হামই ভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হয়েছে : "ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়েরু মা বি-ক্বওমিন হাত্তা ইউগাইয়েরু মা বি-আন্‌ফুসিহিম।" অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তিত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। "ইন্নাহু আ'ওয়াল কার্‌ইয়াতা। ইন্নি মায়ার রহ্‌মানে আতীকা বাগ্‌তান। ইন্নাল্লাহা মু'হিনু কাইদাল কাফেরীন।"-তিনি এই জনবসতিটিকে (-শহর) কিছু দুঃখ-কষ্টের পরে স্বীয় আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন। আমি 'রহ্‌মান' সহকারে (ঐ গুণের বিকাশের মাধ্যমে) অবধারিতভাবে তোমার কাছে হঠাৎ উপস্থিত হবো। আল্লাহ্‌তালা কাফেরদের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনাকে অবধারিতভাবে নস্যাৎ করবেন।"

"এই জনবসতিটি" বলতে কী বুঝায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় 'এই শহরটি' বলতে তো কাদিয়ানই ছিল। এবং বর্তমানকালে 'এই শহরটি' বলতে – আমি মনে করি, ঐ শহরটিকে বুঝায় যা কাদিয়ানের প্রতিনিধিত্বে 'রাবওয়া' স্বরূপে কায়েম করা হয়েছে। আর এই শহরটি সম্পর্কেই দুশমনদের অত্যন্ত খারাপ পরিকল্পনা রয়েছে। এই শহরবাসীদের অনেক দুঃখ কষ্ট দেয়া হয়েছে। **"এই জনপদটিকে কিছু দুঃখ-কষ্ট (সংঘটিত) হবার পর নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করবো" – এই ইলহামী বাক্যটি বস্তুতঃ এক আযীমুশ্বান সুসংবাদ বহণ করে। যে জন্য আমাদের দোয়াও করা উচিত এবং সাধ্যমত চেষ্টাও করা উচিত, আল্লাহ্‌তাআলা যেন 'এই জনপদটিকে' এখন নিজের আশ্রয়ে তুলে নেন। তাঁর নিরাপত্তার আশ্রয়ে তো উহা সব সময়ই থেকে এসেছে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে দুশমনের অনিষ্টকারিতা থেকেও যেন স্বীয় আশ্রয়ে গ্রহণ করেন**। কেন না, সময় অনেক বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। (জলসা-গাহে কাদিয়ান থেকে আগত আহমদীগণ হুযূরের ভাষণটির ঐ পর্যায়ে *'কাদিয়ান-দারুল -আমান-যিন্দাবাদ'* বলে না'রা উচ্চারণ করেন কিন্তু রাবওয়া থেকে আগতগণ তখনও নীরব ছিলেন। তাতে হুযূর বল্‌লেন, 'কাদিয়ান-ওলারা না'রা লাগালো। অথচ রাবওয়া-ওলাদের কোন হুঁশ নেই। তখন রাবওয়া-ওলারাও *'রাবওয়া-যিন্দাবাদ'* বলে না'রা ধ্বনি উচ্চারণ করলেন– অনুবাদক)। অতঃপর হুযূর বলেন, বিশেষভাবে আমি "কারিয়া" (জনপদটি)-এর ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাবওয়ার কথাই উল্লেখ করেছিলাম। কেননা, বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত ইল্‌হামসমূহের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী তাতে বর্ণিত সুসংবাদটি রাবওয়ার ওপরই প্রযুক্ত হয়। তারপর আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "আমি 'রহ্‌মানে'র সহযোগে অবধারিতভাবে হঠাৎ উপস্থিত হবো।" অদ্ভুত বিষয়টি এই যে, রহমান খোদা নিজে এই ইলহাম নাযেল করছেন আর তিনি বলছেন, 'আমি রহ্‌মানের সাথে হঠাৎ তোমার কাছে আসবো'-এর অর্থ হচ্ছে, 'এরূপ সাহায্য-সহায়তা করবো যে, আমার 'রহমানীয়ত' সবদিক দিয়ে আলোকসম্পাৎ করবে। আর এই রহ্‌মানীয়তেরই ফলশ্রুতিতে তোমার সাহায্যার্থে আমার সেই আগমন ঘটবে।' তারপর বলা হয়েছে। "আল্লাহ্‌তাআলা অস্বীকারকারীদের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনাকে নস্যাৎকারী (হবেন)।" **বস্তুতঃ ইহাও একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা ইনশাল্লাহ্‌তাআলা – আমি আশা রাখি, আমাদের চোখের সামনেই বাস্তবায়িত হবে**।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ সালে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "রাত্রিতে আমি দেখলাম একটি বড়ো বাটি ভরা শরবত আমি পান করেছি। এর মিষ্টতা এতো বেশি যে, আমার রুচিতে উহা সহ্য হচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও উহা আমি পান করি। আর আমি তখন মনে মনে ইহাও ভাবি যে, 'আমার তো (বহুমূত্র রোগবশতঃ) ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। এতো মিষ্টি এবং বহুল পরিমাণ শরবত আমি কেন পান করছি?' কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ঐ শরবত পান করি।" অত:পর তিনি বলেন, "শরবতের তা'বীর বা অর্থ হয়ে থাকে সফলতা। আর ইহা ইসলাম এবং আমাদের জামাতের সাফল্যের সুসংবাদ বটে।"

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখবেন যে, শরবত উহার মিষ্টতা (জনিত অনিষ্টের আশঙ্কা) সত্ত্বেও পান করা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ঐ শরবতের মিষ্টতার সুবাদে কিছু দায়িত্বভারও ন্যস্ত হয়, যার ফলশ্রুতিতে চিন্তা-ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং কিছু অস্থিরতা আপতিত হয়। ইহা আমি আমার অন্তরের অবস্থা যা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের কাছে বর্ণনা করছি। জামাত যতো বিস্তার লাভ করে চলেছে এবং মিষ্টি শরবত সব দিক থেকে আমার নিকট পৌঁছুচ্ছে, এই শরবত আমি পান করি, পেট তাতে ভরেও যায় কিন্তু এই আগন্তুকদের আমরা কী ক'রে শামলাবো? কী ব্যবস্থা হবে যার ফলশ্রুতিতে আমরা নবদীক্ষিতদের ক্রমবর্ধমান এই ব্যাপক জামাতের তরবীয়ত দিতে এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় গড়ে তুলতে পারবো। এই মহতী কাজ প্রতিনিয়ত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। অতএব, উক্ত রো'ইয়া দ্বারা এ বিষয়টিই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শরবত মিষ্ট তো বটে, কিন্তু এরই সাথে কিছু জিম্মাদারীও ন্যস্ত হয় নিঃসন্দেহে। ঐ সব জিম্মাদারীর জন্যে অস্থিরতা চিন্তা-ভাবনা তো রয়েছে বটে, কিন্তু এই দুশ্চিন্তার দরুন আপনারা এই শরবত পান কখনও পরিত্যাগ করতে পারেন না, কখনও তা থেকে বিরত হতে

পারেন না। ছড়িয়ে যেতে থাকুন, যতো দ্রুতগতিতে পারেন ছড়িয়ে পড়ুন। জিম্মাদারীসমূহ বহন ও পালনের শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং আপনাদের দান করবেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৮৯৮ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আজ ভোরবেলায় আমার ওপর এই ইল্‌হাম হয়, "কাদের হ্যায় উওহ্ বারগাহ্ টূটা-কাম বানাওয়ে, বানা-বানায়া তোড় দেড় কোই ইস্‌কা ভেদ না পাওয়ে।"

অতএব, এই ইল্‌হামের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা রাখি যে, 'বারগাহে-ইলাহী' আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন কাজও সুসংহত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন। **যতোগুলো কাজই আমাদের কাছে ছিন্ন-ভিন্ন বলে পরিলক্ষিত বা প্রতীয়মান হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর ফযল ও অনুগ্রহের দ্বারা সেগুলোকে জোড়া দিয়ে দিবেন। আর ঐ সব লোক যারা, তাদের কাজকে তৈরী এবং সর্বতঃ ঠিক-ঠাক বলে ভাবছে, সেগুলোকে এরূপ ছিন্ন-ভিন্ন করবেন যে, কেউ এর রহস্য খুঁজে পাবে না।**

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, **"আমি যুগ-ইমাম। খোদা আমার সাহায্যকারী এবং তিনি আমার পক্ষে তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।"** হুযূর বলেন, কতো শক্তিমত্তা ও জোর বিদ্যমান বর্ণনাটিতে! 'আমি যুগ-ইমাম'। যাঁকে খোদা যুগ-ইমাম নিযুক্ত করেন তাঁকে সাহস-বীরত্বও দান করে থাকেন। সমগ্র দুনিয়ার বিরোধিতার মোকাবিলায় তিনি একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করে থাকেন যে, 'আমার কোনও ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না।' অতঃপর তিনি বলেন, **"আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে. যে-কেউ আমার বিরুদ্ধে দুষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে দাঁড়াবে, সে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হবে। দেখ, আমি সেই আদেশ তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিলাম যার দায়িত্ব আমার ওপরে ন্যাস্ত ছিল।"**

এরপর আমি এই উদ্বোধনী ভাষণটি যা সংক্ষেপেই হওয়া উচিত এবং আমি চেষ্টা করেছি যাতে সংক্ষেপে এ বিষয়গুলো আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করি– হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই বাণীর ওপর এ বক্তব্য সমাপ্ত করছি। তিনি বলেন, "সত্য কথা ইহাই যে, তোমরা এই ঝরণার নিকটে তো পৌঁছে গেছো যা এখন (এই যুগে) খোদাতালা চিরস্থায়ী জীবনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তবে (তোমাদের পক্ষে) এর পানি পান করা এখনও বাকী আছে।"

আপনারা মনে করবেন না যে, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই শরবতের স্বাদ ভোগ করে ফেলেছেন, পরিতৃপ্ত হয়েছেন সেই শরবত পানে, যার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, স্বর্গীয় পানি-ই সেই শরবত। তিনি (আঃ) বলছেন, যে, তোমাদেরকে তিনি একটি কথা বুঝিয়ে দিতে চান, "তোমরা সেই ঝরণার নিকটে তো পৌঁছে গেছো–তা তোমাদের হাতের নাগালে তো এসে গেছে, কিন্তু অন্তরে এই ভুল বুঝাবুঝিকে স্থান দিও না যে, তোমরা এর পানি পানেও সমর্থ হয়েছ। **বহুল সংখ্যক এরূপ আহ্‌মদী 'আহ্‌বাব' (ভাই-বোন) রয়েছেন যাদের হাতের নাগালে এই স্বর্গীয় পানি উপস্থিত রয়েছে কিন্তু পান করা এখনও হয়ে ওঠে নি। যখন তারা পান করতে সমর্থ হবেন তখন তাদের বক্ষদেশ (-অন্তঃকরণ) থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ঐ সমস্ত ঝরণা উৎসারিত হবে যা তামাম জাহানের সিঞ্চনের কারণ হবে।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "অতএব, তোমরা খোদাতাআলার সমীপে তাঁর ফযল ও করম হতে তওফীক প্রার্থনা কর।" পানি পর্যন্ত পৌঁছাও তাঁর ফযল ও অনুগ্রহস্বরূপ ছিল, পান করার তওফীকও তাঁর ফযল ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। অতএব, খোদাতাআলার ফযল ও করমের মাধ্যমে ঐ তওফীক প্রার্থণা কর। তাঁর দেওয়া সেই তওফীক তোমাদেরকে সিক্ত ও সিঞ্চিত করবে। কেননা, খোদাতাআলার সাহায্য-সহায়তা ব্যতিরেকে কোন কিছুই সম্পন্ন হতে পারে না। ইহা আমি নিশ্চিৎ জানি, যে-কেউ এই উৎস থেকে পান করবে, সে ধ্বংস হবে না। কেননা, **এই পানি জীবন দান করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে এবং শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ রাখে।** এই উৎস থেকে পান করার কী উপায়? তা এই যে, খোদাতাআলা যে দুই প্রকার হক্ (দায়িত্ব) কায়েম করেছেন, তা পুরোপুরি পালন ও প্রতিষ্ঠিত কর। সেগুলোর মধ্যে এক প্রকার হক্ হচ্ছে খোদাতাআলার, আর দ্বিতীয় প্রকার হক্ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির (প্রাপ্য) হক।"

অতএব, যদি আপনারা চান যেন আল্লাহতাআলা আপনাদের তওফীক দান করেন যাতে এই উৎস থেকে পান করে আপনারা সিঞ্চিত হতে পারেন এবং দুনিয়াকেও সিঞ্চিত করতে পারেন, তাহলে দোয়ার পাশাপাশি কার্যতঃ এই সকল পবিত্র পরিবর্তনও নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন। .....যেমন কিনা তোমরা কলেমা শাহাদতের দ্বারা তোমরা অঙ্গীকার করে থাক- 'আশ্‌হাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মাহ্‌বুব, মতলুব (কাম্য) ও মাতা' (আনুগত্যের পাত্র) ও ইবাদতের যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নেই।" **সারা দুনিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্-র না'রা দ্বারা ভরে দাও- এরূপ না'রা, যা গগণ বিদারী হয়, সেই সাথে তোমাদের হৃদয়বিদারীও হয় যাতে সেখানে খোদা অবতীর্ণ হন।** যদি তদ্রূপ করেন, তাহলে আপনারা চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হবেন। কেউ নেই যে আপনাদেরকে ধ্বংস করতে পারে। (ওডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
সদর মরব্বী

সংশোধনী

সংখ্যা	তারিখ	পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	পড়বেন
৩	১৫-৮-৯৮	২৮	১৯	এবং	এক
"	"	"	৩২	জীবন	জীবনের
"	"	"	৪৩	আনীত	প্রণীত
"	"	২৯	২	১০ই জুন	১০ই জুলাই

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

হে এই গ্রন্থের পাঠকবৃন্দ! খোদাকে ভয় কর। একবার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি দেখ এবং এই সর্বশক্তিমান খোদার নিকট দরখাস্ত কর যেন তিনি তোমাদের হৃদয়কে সততার জন্য খুলিয়া দেন। খোদার দয়া হইতে নিরাশ হইও না।

মূল গ্রন্থে এখানে ফার্সী ভাষায় একটি কবিতা আছে। কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:-

ময়দানে নাম এবং আমার অবস্থা দেখ। মহা প্রতাপান্বিত খোদার যে সাহায্য আমার সাথে আছে তাহা দেখ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া আমাকে যে অপবাদ দাও তাহা তোমাদের কাপুরুষতা। পরীক্ষায় অবতীর্ণ হও তখন বুঝিবে আমি কোন্ স্তরের মানুষ।

হে প্রিয়রা! এবাদুর রহমান (আল্লাহ্‌র দাস) সম্পর্কে ত্বরিৎ কুধারণা করা বৈধ নহে। যে সকল লোক পূর্বের সম্মানিত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে কুধারণা করিয়াছে তাহারা কী ফল পাইয়াছে? এই ধারণাও তোমাদের হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দাও যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মসীহ মাওউদ ও মাহদী মা'হুদ-এর ঐ সকল লক্ষণাবলী (যাহা কেবল ধারণামূলক বর্ণনার ভিত্তিতে তোমাদের হৃদয়ে আছে) পূর্ণ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা কখনো ঠিক নহে। এই কথা ঐ সকল ইহুদীর কথার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ যাহারা না হযরত ঈসাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং না আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে। কেননা, যাহা কিছু তাহাদের বর্ণনার ভিত্তিতে নিদর্শন সাব্যস্ত করা হইয়াছিল উহাদের সবগুলি পূর্ণ হয় নাই। অতএব তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের সাব্যস্তকৃত লক্ষণসমূহ পূর্ণ হইয়া যাইবে? না, বরং এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি পরীক্ষাও গুপ্ত থাকে! খোদা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন। তোমরা তাঁহার নিদর্শাবলীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেছ কি না। সকল বর্ণনা কবে সত্য হয়? অনেক মিথ্যা কথা উহাদের সহিত মিলিয়া যায়। উহাদের উপর পূর্ণ ভরসা করা বিপজ্জনক ব্যাপার।

ইহাতো বল কোন নবীর ব্যাপারে সাব্যস্তকৃত লক্ষণসমূহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহা পূর্বের জাতি সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল? অতএব খোদাকে ভয় কর এবং পূর্বের হতভাগ্য অস্বীকারকারীদের ন্যায় খোদার প্রেরিত পুরুষকে এই কথার উপর প্রত্যাখ্যান করিও না যে, তোমরা তাহার মধ্যে ঐসকল সাব্যস্তকৃত লক্ষণাবলী পাও নাই। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখ, এই ব্যাপারটি কাহারো নসীব হয় নাই যে, তাহাদের সাব্যস্তকৃত লক্ষণাবলী আগমনকারী নবীর মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই জন্যই তাহারা হোঁচট খাইয়াছে এবং জাহান্নামে পড়িয়াছে। নতুবা সকল লক্ষণ পাওয়ার পর অস্বীকার করা মানুষের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে। কোন কোন বিষয় হোঁচট খাওয়ার মত, যদ্দ্বারা হতভাগ্য মানুষ হোঁচট খায়। ইহুদীদের ধারণা ছিল আগমনকারী মসীহ এক বাদশাহ্‌রূপে আসিবেন এবং তাহার পূর্বে ইলিয়াস নবী পুনরায় আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। অতএব এই কারণেই আজ পর্যন্ত তাহারা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নাই। কেননা, না তো তাহার পূর্বে ইলিয়াস নবী আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং না হযরত ঈসা বাদশাহ্ হইলেন। চেষ্টা তো করা হইয়াছিল ; কিন্তু উহাতে ব্যর্থ রহিলেন। ইহা ছাড়া আমাদের নবী (সঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের আলেমরা বরং তাহাদের সকল নবীও ইহাই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ঐ আখেরুজ্জামান নবী বনী ইসরাঈল হইতে আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু এইরূপ ঘটিল না। বরং ঐ নবী বনী ইসমাঈল হইতে আবির্ভূত হইয়া গেলেন। তখন লক্ষ লক্ষ ইহুদী তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল। যদি খোদা চাহিতেন তবে এইরূপ সুস্পষ্টভাবে লক্ষণাদিই বর্ণনা করিয়া দিতেন যে, ইহুদীরা হোঁচট খাইত না। কিন্তু যেক্ষেত্রে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্যই এইরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণাদিই বর্ণনা করা হয় নাই, তবে কাহার জন্য বর্ণনা করা যাইত? অতএব স্মরণ রাখ, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীতে পরীক্ষাও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। যাহাদের সুস্থ-বুদ্ধি আছে তাহারা এই পরীক্ষার সময় ধ্বংস হয় না এবং বর্ণনাকে কেবল একটি অনুমান-ভিত্তিক ভাণ্ডার মনে করিয়া নেয়। তাহারা ইহাও মনে করিয়া নেয় যে, যদি কোন বর্ণনা বা হাদীস সঠিকও হয়, তথাপি ইহার অর্থ করিবার ক্ষেত্রে ভুল হইতে পারে। অতএব তাহারা সনাক্ত করণের সকল ভিত্তি খোদার সাহায্য, খোদার সমর্থন, খোদার নিদর্শনাবলী ও সাক্ষ্যসমূহকে সাব্যস্ত করে।

যে সকল লক্ষণাদি বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে তাহারা ঐগুলিকে যথেষ্ট মনে করে এবং অবশিষ্ট বর্ণনাসমূহকে একটি বাজে জিনিসের ন্যায় ছুঁড়িয়া ফেলে। যে সকল সৌভাগ্যশালী ইহুদী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল তাহারা এই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্মপরায়ণরা সর্বদা এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। যদি ধর্মপরায়ণ ও খোদা-ভীরুদের পন্থা ইহা না হইত তবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এক ব্যক্তিও আঁ হযরত (সঃ)-এর উপর ঈমান আনিতে পারিত না এবং না কোন ইহুদী হযরত ঈসাকে গ্রহণ করিতে পারিত। এই দেশে অনেক ইহুদী বাস করে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়া নাও কেন তাহারা হযরত ঈসা ও আঁ হযরত (সঃ)-এর উপর ঈমান আনে নাই। তাহারা তো পাগল নহে। কোন অজুহাত তো তাহাদের নিকট আছে। অতএব তোমরা স্মরণ রাখ, তাহাদের নিকট হইতে তোমরা এই জবাবই পাইবে যে, তাহাদের হাদীস ও রেওয়ায়াতে (বর্ণনায়) যে সকল লক্ষণ লেখা আছে ঐগুলি পূর্ণ হয় নাই। এইভাবে তাহারা এই জিদের উপর কায়েম থাকিয়া জাহান্নামবাসী হইয়া গেল এবং হইয়া চলিয়াছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, সকল সাব্যস্তকৃত লক্ষণ পূর্ণ হওয়া ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা জাহান্নামের পথ, যদ্দরুন কয়েক লক্ষ ইহুদী জাহান্নামবাসী হইয়া গিয়াছে, তখন এই পথকে তোমরা কেন গ্রহণ করিতেছ? অন্যের অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা মু'মিনের উচিত। তোমরা কি অবাক হইতেছ যে, যে পরীক্ষায় খোদাতাআলা ইহুদীদেরকে ফেলিয়াছিলেন ঐ পরীক্ষাই তোমাদিগকেও করা হউক? খোদাতাআলা বলেন, 'আলিফ লাম মীম। আ হাসিবান্নাসু আঁইউতরাকু'। আঁ ইয়াকুলু আমান্না ওয়াহুম লা ইউফতাসূন (সূরা আল্ আন্‌কাবূত ঃ আয়াত ৩) (অর্থ:- লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' আর তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না?- অনুবাদক)। নিশ্চিত জানিও এই আচরণ খোদার, মানুষের নহে। অতএব গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। খোদার সহিত লড়িও না যে, তিনি কেন এইরূপ করিলেন। যদি তোমরা তাকওয়ার দৃষ্টিতে দেখ তবে তোমরা বুঝিতে

(অবশিষ্টাংশ ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জুমুআর খুতবা

সৎসঙ্গের প্রবল আকর্ষণী ক্ষমতা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা তাং ১লা মে, ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহার পর হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) সূরা তওবার ১১৯ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

"ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ্ ওয়া কূনূ মায়াস্ সদেকীন।"

অনুবাদ : "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্য অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।"

এই আয়াতের উপর আলোচনার পূর্বে একটি কথা বলে দিচ্ছি যে, আজ বিকাল ৪ টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর ১৭তম মজলিসে শূরা আরম্ভ হতে যাচ্ছে (ইনশাআল্লাহ্)। এই মজলিসে শূরা তিন দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। তারা অনুরোধ জানিয়েছেন যে, বেলজিয়ামে আজকের যে অধিবেশন হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে যেন সম্বোধন করি। অনুরূপভাবে সুইডেনেও আজ অধিবেশন বসতে যাচ্ছে। তাদেরও আকাঙ্ক্ষা যে, তাদেরও যেন স্মরণ রাখি এবং তাদেন নাম উল্লেখ করি যেন সারা পৃথিবী থেকে তারা দোয়া পেয়ে যান। তারা আমার নির্দেশাবলী অনুসরণ করে উত্তমরূপে শূরা করবেন বলে বলেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে মজলিসে শূরার নেযাম দিন দিন ব্যাপক প্রসারতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে চলেছে। **আমার একান্ত চেষ্টা এই যে, সর্বত্র মজলিসে শূরা কেন্দ্রীয় শূরার পুরাতন রীতি-নীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হোক। প্রত্যেক দেশে যেন নতুন নতুন রীতি প্রচলিত হতে না পারে।** যেমন ধরুন, আজকেই জার্মানী হতে খবর এসেছে যে, তারা সম্ভবতঃ দীর্ঘ এজেন্ডা প্রস্তুত করেছিলেন অথবা কোন কারণে তারা চিন্তা করেছিলেন যে,শূরার ছোট ছোট কয়েকটি সাব-কমিটি না করে পুরো মজলিস এজেন্ডার সমস্ত প্রস্তাবগুলোর উপরে একই সময়ে বিবেচনা করবেন। অথচ এমন করাটা তো একটা Innovation– নতুন প্রথা– 'বিদ্‌য়াত', যা জার্মানীর মতো উত্তম কর্মকান্ডসম্পন্ন জামাতের দ্বারা আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। 'আলহামদু লিল্লাহ্' আমি যথা সময়ে তাদের এজেন্ডা এবং বিস্তারিত প্রোগ্রাম জেনে নিয়েছিলাম এবং তাৎক্ষণিক আদেশ দিয়ে ছিলাম যে, কখনও এমন হতে দেয়া যাবে না। তাদের মজলিসে শূরাও অন্যান্য স্থানে যেভাবে হয়ে থাকে ঐভাবে হবে। তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক প্রোগ্রাম সংশোধন করে নিয়েছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)।

জার্মানীর এজেন্ডার বিভিন্ন প্রস্তাব আমি চিন্তা করে দেখলাম। অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন এমন সব প্রোগ্রাম গ্রহণ করার প্রস্তাবসমূহ রাখা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা ছাড়া এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, বিগত এক/দুই বছর ধরে তাদের বিভিন্ন প্রকার নিয়মিত চাঁদার মধ্যে স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ্‌র ফযলে সেখানে অনেক ব্যবসায়ী এবং এমন অবস্থাশালী লোকেরা আছেন, যদি তারা নিজেদের বাজেট ঠিক করে লেখান এবং আদায় করেন, এমনকি কেবলমাত্র ওসীয়্যতের চাঁদাই যদি ঠিকমত জার্মানী জামাত আদায় করেন তবে পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থা হয়ে যাবে।. [এই সময় লাউড স্পিকারে কিছু গন্ডগোল হলে হযরত সাহেব বলেন, মনে হচ্ছে আপনাদের লাউড স্পিকার কিছুটা নষ্ট, একটু এদিক ওদিক মুখ ফিরালেই আর আমার কণ্ঠস্বর পাওয়া যাচ্ছে না অথচ বার বার বলার পরেও এমনই হচ্ছে। বার বার আমি বুঝিয়েছি তবুও বার বার এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আমাকে একেবারে স্থির হতে হবে, নড়াচড়া করতে পারব না। আর নড়াচড়া করলেই মাইক কথা শুনবে না। অতএব, আমাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে, আশে-পাশে কিছু দেখতে পারব না। যারা আশেপাশে আছেন তাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।]

হুযূর পুনরায় মূল বক্তব্যে ফিরে এসে বলেন, জার্মানীর কথা হচ্ছিল, বিস্তারিত বলার সময় হবে না। আমি মনে করি তাদের মধ্যে আরো বেশি মালী কুরবানীর সামর্থ্য আছে। আমি যে সকল বন্ধুর প্রতি দৃষ্টি দেই, আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সাধারণতঃ আল্লাহ্ পাক তাদের মালসমূহে ও রিয্‌কে অসাধারণ বরকত দেন বা বৃদ্ধি পায়। এদের সকলে যদি ওসীয়্যতের চাঁদা ঠিকমত আদায় করেন তবে জার্মানীর জামাতের আর্থিক অনটন থাকতেই পারে না। কিন্তু তারা বড় আশা করে অতি ব্যয়বহুল প্রোগ্রামের প্রস্তাব এনেছেন অথচ আয় তদ্রূপ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং আপনারা এ দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করুন। আপনাদের আজকের শূরার অধিবেশনে অর্থ সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনায় আনবেন এবং আমি যেন সন্তোষজনক রিপোর্ট পাই। আপনারা আপনাদের প্রোগ্রামগুলিকে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বানাবেন। নতুন কিছু প্রোগ্রাম কম করতে হবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সর্বদা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি কখনও এমন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য রাখতেন না যার আর্থিক সংগতির উপায় বের না করতেন। যতক্ষণ মজলিসে শূরা তার প্রস্তাবসমূহের বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থের পৃথক ব্যবস্থা দেখাতে না পারত ততক্ষণ এমন প্রস্তাব শূরার বিবেচনার জন্য রাখা হত না। এমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই শূরার প্রস্তাব রাখা হতো। এখন আমার হাতে এত বেশি সময় ছিল না যে, কোন কোন প্রস্তাব আমি নিজেই বাদ দিয়ে দিতাম অথবা কোনটাকে কিছু কিছু করে দিতাম।

অতএব, মজলিসে শূরা এবং আমীরের কর্তব্য হবে যে, প্রথমে আর্থিক সংগতি অনুসারে এসব দিক বিবেচনা করে আগামী বছরের জন্য আপনাদের প্রোগ্রামসমূহ প্রস্তুত করুন। দোয়ার জন্য সুইডেনের যে আবেদন আছে-তা তো থাকবেই, তার সাথে আমি আরো কিছু বলতে চাই। আল্লাহ্‌র ফযলে সুইডেন জামাত পুরাতন অনেক কিছু পরিত্যাগ করে নতুনভাবে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আশা করি তাদের মজলিসে শূরাও ধর্মীয় ভাব ও গাম্ভীর্যের মধ্যে পবিত্র পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে এবং সুইডেন পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে উন্নতি করবে।

এখন আমি ঐ বিষয়ে বর্ণনা করব যা এই আয়াতে করীমায় উল্লেখ আছে। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণদের সংগী হয়ে যাও। আজকে এই খুতবার জন্য এই আয়াতটি চয়ন করেছি এই জন্য যে, গত খুতবায় নসিহত করেছিলাম যে, মন্দ লোকদের নিকট থেকে দূরে সরে যাও – যতদূরে পলায়ন করা সম্ভব ততদূরে পালিয়ে যাও। এবং ন্যায়নিষ্ঠদের সাথে বস। কেননা, শুধু মন্দদের থেকে দূরে পলায়ন যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন এই যে, পালিয়ে কোন দিকে যাও ? যদি মন্দ লোকদের থেকে দূরে পালাতে চাও তবে এর চেয়ে ভাল জায়গায় যাওয়া উচিত এবং এটি সেই কথা যা হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ) পরিষ্কার করে বর্ণনা করে গেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও এর উপর অনেক বেশি আলোকপাত করেছেন।

প্রথম বর্ণনা যা আমার সামনে উপস্থিত তা "তিরমিযী" থেকে নেওয়া হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল (সঃ) বলেছেন; এমন মজলিস যারা আল্লাহ্‌র যিকির করে, ফিরিশ্‌তাদেরকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদের ঢেকে রাখে। তাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ্ তাদের যিকরে ইলাহীর কথা নিজের সন্নিধানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরেন।

এই শেষোক্ত বাক্যটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন; যে মজলিস যিকরে ইলাহীতে রত থাকবে এদের প্রতি আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা নাযেল হবেন। যিকরে এলাহী মু'মিনদের প্রাত্যহিক রত থাকার কাজ। কিন্তু এখানে বলা হলো যে, যারা মজলিসে বসে যিকরে এলাহী করে তাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়েছে। আর আঁ হযরত (সঃ)-এর বর্ণনানুসারে এদের মধ্যে ফিরিশ্‌তারা অবতীর্ণ হন। এই বিষয়টি আঁ হযরত (সঃ) আরো অনেক স্থানে বর্ণনা করেছেন।

আমি এখানে আপনাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাদের উপর ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হতে অভ্যস্ত যাঁদের মজলিস সর্বদা যিকরে এলাহীতে পরিপূর্ণ – তাঁরা এক মুহূর্তের জন্য কি করে ঐ ধরনের মজলিস সহ্য করতে পারবেন, যে মজলিসে ধর্মের নামে কলঙ্ক রটানো হয় ? অতএব, এই দুই কথা একত্রে পাশাপাশি চলতে পারে না। যারা যিকরে এলাহীর মজলিসে বসে অভ্যস্ত তারা এমনটি চিন্তাও করতে পারে না যে, চলো, ঐ মন্দ লোকদের মজলিসে গিয়ে একটু উঁকি দিয়ে দেখে আসি যে, তারা মন্দ আলোচনায় লিপ্ত আছে কি না ভাল কথা বলছে । সুতরাং আমি গত শুক্রবারের খুতবায় আপনাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করেছিলাম। আজকে পুনরায় বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করে বলছি যেন, আপনারা কখনও ভুল না করেন। একজন সত্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও মন্দ লোকদের সংগে সহ-অবস্থান করার চিন্তাও করতে পারে না।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন; – ইয়া রসূলাল্লাহ্! কোন ধরনের মানুষের নিকট বসা উত্তম ? আঁ হযরত (সঃ) জবাবে বলেন : "ঐ ব্যক্তির নিকট বসা উচিত যাকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা মনে হয়।" এখানে দেখুন,তাদের অভ্যাস এমন লোকদের সাথে বসা যাদের দেখলে খোদাকে স্মরণে আসে। তারা কি কখনও ঐ সকল মজলিসে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইবে, যাদের দেখলে শয়তানের কথা মনে হয়। সুতরাং এ দু'টি, পরস্পর বিরোধী কথা। এটা একেবারে মূর্খতার কথা যে, কখনও কখনও ঐ সকল মজলিসে চলে যাও যেখানে শয়তানের প্রশংসার কথা বর্ণনা করা হয়। অতএব, খুব ভাল কথা আঁ হযরত (সঃ)-এর কথা শুনে রাখুন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন : এমন ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে বসা বা অবস্থান করা লাভজনক যাকে দেখে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যায়। যাদের কথা শুনলে তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে অর্থাৎ তিনি কখনও বাজে কথা বলেন না বরং যখনই কোন কথা বলেন তাতে তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। তোমাদের জ্ঞানের পরিধি যা-ই হোক না কেন, এবং তাঁর আমল (কর্ম) দেখলে তোমাদের পরকালের কথা স্মরণ হবে। যার সৎকর্ম দেখলে তোমার মনে পড়বে, আরে! ইনি তো দেখা যাচ্ছে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি কি প্রস্তুতি নিয়েছি ? এই দিক দিয়েও পরকালের প্রস্তুতির কথা স্মরণ হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন; (বুখারী-কিতাবুল ঈমান) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তিনটি কথা আছে, যার মধ্যে ঈমানের স্বাদ বা মজা পাওয়া যাবে। প্রথমত : এই যে, আল্লাহ এবং এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সঃ) বাকী সব কিছুর তুলনায় তার কাছে বেশি প্রিয়। দ্বিতীয়ত ঃ সে একমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে কাউকে ভালবাসে।"

সাধারণতঃ মানুষ একে অপরের সাথে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক রাখেই। ভালবাসা ছাড়া তো মানুষের জীবন জীবনই নয়। কাউকে না কাউকে মানুষতো ভালবাসবেই। এখানে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, মানুষের উচিত সে যেন আল্লাহ্‌র খাতিরে একে অপরকে ভালবাসে। এখানে একথা বড় স্পষ্ট যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরেই একে অপরকে স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে মনোনীত করে থাকেন। এই কথার উপরই চিন্তা করে দেখুন, এই উপদেশ পালনের মাধ্যমেই আমাদের সমাজের বহু অনাচার দূর হতে পারে। অধিকাংশ লোক বিয়ের সময়ে এ কথাকে লক্ষ্য করে না। সুন্দর চেহারা বা বড় বংশ দেখে বিয়ে করা তো দোষের নয়। কিন্তু প্রধান শর্ত পূরণ হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ মেয়েটি আল্লাহ্-প্রেমিক কিনা এটা দেখা দরকার, অথবা পুরুষ আল্লাহ-প্রেমিক কিনা। যদি প্রধান শর্ত পূর্ণ হয় এবং তার সাথে আরো কিছু ভাল গুণও থাকে তবে খুব ভাল হয়। আর এটা অস্বীকার করা হয় নি। কিন্তু আপনি যদি প্রধান শর্তকে অগ্রাধিকার দেন তবে এ সম্পর্কের ফলে একে অপরের প্রতি যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে, সেখানে আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাধান্য পাবে এবং এর ফলে সমাজ বড় পবিত্র এবং বড়ই সুন্দর হবে। দ্বিতীয়তঃ কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে কারো সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা। তৃতীয়তঃ কুফরী থেকে (বে-ঈমানী) ঈমান হাসিল হওয়ার পর কুফরী অবস্থায় ফেরৎ যাওয়াকে সে এমন খারাপ মনে করে যেমন আগুনে প্রবেশ করাকে খারাপ মনে করে।

আমাদের জামাতের উপর যে বড় বড় পরীক্ষা আসে, এ সঙ্গে শেষ কথাটি সবারই স্মরণ রাখা দরকার। এখানে যে সব দেশে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলে মনে করা হয়, এখানেও এসব হচ্ছে। হল্যান্ড জার্মানীর মত দেশেও একজন সমাজের সম্মানীত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যখন আহমদীয়ত গ্রহণ করছেন তাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৌলবীর নিকট। কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন শারীরিক কষ্টও দেয়া হয়েছে। এত কঠিন কষ্ট যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মরে কি বাঁচে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অবস্থা কেবল পাকিস্তানেই নয় বরং সবত্রই বিরাজমান। পাকিস্তানে তো সীমাহীন। কিন্তু অন্যান্য দেশেও এ অবস্থা বর্তমান। এমন সময় আঁ হযরত (সঃ)-এর এই নির্দেশ স্মরণ রাখবেন যে, **পূর্বাবস্থায় ফেরৎ যাওয়াকে সে এমন মনে করবে যেমন আগুনে প্রবেশ করাকে সে মনে করে থাকে নতুবা তার ভাগ্যে চিরস্থায়ী জাহান্নামই জুটবে।** সুতরাং সে আগুনে প্রবেশ করাকে বেশি পসন্দ করবে অথবা সে আগুনে প্রবেশ করাকে যতটা খারাপ মনে করে তার চেয়ে বেশি খারাপ মনে করবে পূর্বের ভুল ধারণার জগতে ফিরে যাওয়াকে। আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রসংগে হযরত দাউদ (আঃ)-এর একটি দোয়া সর্বদা পাঠ করতেন। এই দোয়াটি আঁ হযরত (সঃ)-এর খুবই প্রিয় দোয়া ছিল। হুযূর (সঃ) হুবহু হযরত দাউদ (আঃ)-এর দোয়াটি পড়তেন। আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলতেন, হযরত দাউদ (আঃ)-এর দোয়াসমূহের একটি দোয়া এইরূপ ছিল, **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মা ইউহিব্বুকা।'** অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট থেকে তোমার ভালবাসা চাই এবং এই ব্যক্তির ভালবাসা চাই, যে তোমাকে ভালবাসে। **ওয়াল আমানুল্লাযী ইউ বাল্লেগুনি হুব্বাকা,** অর্থ : এবং এমন কর্মের প্রতি ভালবাসা চাই, যে কর্ম আমাকে তোমার ভালবাসা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে। কি চমৎকার! খুবই যাচাই ও বাছাই করা বাক্য। "এমন কর্মের প্রতি আমার মনে যেন ভালবাসা সৃষ্টি হয়, যে কর্ম আমাকে তোমার ভালবাসা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে।" এমন কর্ম করতে চাই– "*আল্লাহুম্মা জাআল হুব্বাকা –*" হে আল্লাহ্ তোমার ভালবাসাকে করে দাও, **আ-হাব্বা ইলায়য়া** – আমার কাছে সবচে' বেশি প্রিয়। মিন

নাফসী আমার নিজ আত্মার চেয়েও বেশী প্রিয় **'ওয়া আহলী'** এবং আমার পরিবার-পরিজনের চেয়েও বেশি প্রিয়। 'ওয়া মিনাল মায়িল বারেদা-এবং ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয়।

[পুরো দোয়াটি: "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা হুব্বাকা, ওয়া হুব্বা মাঁইইউহিব্বুকা, ওয়াল্ আমানুল্লাযী ইউবাল্লিগুনি হুব্বাকা, আল্লাহুম্মাজআল হুব্বাকা, আহাব্বাইলাইয়া, মিন নাফ্‌সী ওয়া আহ্‌লী ওয়া মিনাল মায়ীল বারিদ।"]

আঁ হযরত (সঃ) এখানে যে দোয়া শিখিয়েছেন, আমি আর্শ্চয হলাম যে, এখানে বাক্যগুলিতে সিগা ওয়াহিদ একবচন ও First Person ব্যবহার করা হয়েছে কেন? বহুবচন ব্যবহার করেন নি। একবচন ব্যবহার করার অর্থ এরূপ দাঁড়িয়েছে, 'আমি তোমার ভালবাসা চাই।" যদি বহুবচন ব্যবহার করা হত তবে –"আমরা তোমার ভালবাসা চাই" হত এবং সকলের জন্য হত। হুযূর নবীয়ে করীম (সঃ) সকলের জন্য কেন এই দোয়া করেন নি? প্রকৃত ঘটনা এই যে, আঁ হযরত (সঃ) যখন ইন্নী– (অর্থ :–আমি) বলেছেন, তখন তাঁর (সঃ) খুব ঘনিষ্ঠ অনুগতরাও তাঁর (সঃ) মধ্যে শামিল বলে গণ্য হয়েছেন। এই কারণে আল্লাহ্‌তাআলা অনেক সময় হুযূর (সঃ)-কে এককভাবে সম্বোধন করেছেন এবং সকল মুসলমান হুযূর (সঃ)-এর সাথে শামিল বলে গণ্য হয়েছেন। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, আঁ হযরত (সঃ) যখন নিজের জন্য দোয়া করেছেন অথবা হযরত দাউদ (আঃ) যখন দোয়া করেছিলেন নিজের জন্য তখন তাঁর (দাউদ-আঃ) অনুসারীরাও তাঁর সাথে শামিল ছিলেন, যারা তাঁর সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

সুতরাং আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্মানের খাতিরে আমি যখন এই দোয়া করি তখন –'ইন্নী' বলেই দোয়া করি। কেননা, রসূল (সঃ) 'ইন্নী' বলেছেন, শব্দ পরিবর্তন করেন নি তাই আমিও করি না। আপনারাও এমনই করবেন কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত নিবেদন যে, **আল্লাহ্ যেমন নবীগণের সাথে তাঁদের জামাতের সদস্যদের শামিল করেছেন তেমনই আমাদের পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব যারা আমাদের নিকটের এবং আমরা যাদের ভালবাসি এবং তারাও আমাদেরকে ভালবাসেন। আমাদের সবাইকে যেন এই দোয়ার মধ্যে শামিল করে নেন। কেননা, এই দোয়া বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যদি গৃহীত হয়ে যায় তবে সবার দোয়াই গৃহীত হয়ে গেল।**

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেয়ে গেল তার তো আর কিছুর প্রয়োজন থাকে না। কারণ আল্লাহ্‌র ভালবাসার মধ্যে সকল ভালবাসা এবং পৃথিবীর সকল সমস্যা যার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল সমস্যা সমাধানেও আল্লাহ্‌র ভালবাসার মধ্যে আছে।

সুতরাং কথার মধ্যে সামান্যও অতিরঞ্জন নেই যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার ফলে আপনার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে আর যদি এটা হয়ে যায়, তবে সকল কিছুই হয়ে গেল।

অতএব আঁ হযরত (সঃ)-এর এই বাক্যের মাধ্যমে যদিও কেবল নিজকে তুলে ধরা হবে যে, 'আমাকে তোমার ভালবাসা দান কর।" কিন্তু যেভাবে আমি বল্লাম যে, সকল নিকট আত্মীয়ের এবং প্রিয়জন অর্থাৎ যাদের সাথে আপনার মধুর সম্পর্ক আছে, যারা আপনাকে ভালবাসে তাদেরও শামিল করুন।

এবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, –"স্মরণ রাখ যে, আমি মানবজাতির সংশোধনের জন্য এসেছি। যারা আমার নিকট আসে তারা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে, কিন্তু **আমি স্পষ্ট বলছি যে, যারা বাহ্যিক বয়াত করে চলে যায়–পরে তার খবরও পাওয়া যায় না** যে, সে কোথায়, কি করে? তার জন্য কিছুই নেই। সে যেমন খালি হাতে এসেছিল তেমনি খালি হাতে চলে গেল।"

আজকাল অসাধারণভাবে তবলীগের কাজ চলছে। বিশেষ করে যেসব দেশে বেশি বেশি প্রচার কাজ চলছে, যেমন–আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে পশ্চিম জার্মানী শীর্ষস্থানে আছে। তাদের এবারের প্রস্তাবগুলোতে বিশেষ করে তবলীগের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আমি এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবলীগের মাধ্যমে এমন লোক আমাদের প্রয়োজন যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকটের লোক হবে এবং তারা জামাতের লোকদের সহযোগিতার মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আর এটা তবলীগের একটি বড় মাধ্যম হিসাবে আমাদের কাছে সরাসরি একটি অদৃশ্য সত্তাকে ধারণা করে নেয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। একটি অদৃশ্য শক্তি তা বড় হলেও তাকে পাওয়ার জন্য অবশ্যই একটি মাধ্যম দরকার। এই কারণেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য মুহাম্মদ (সঃ)-এর নৈকট্য আবশ্যক হয়েছে। এভাবে আঁ হযরত (সঃ)-কে দেখে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য লাভ হয়েছে। কারণ আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ্‌র পবিত্র গুণাবলী বিরাজমান।

সুতরাং বিষয়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। যাকে আপনি নিকট থেকে দেখেন, আপনার অন্তরে সে একটা স্থান দখল করে নেয়। আল্লাহ্‌কে আপনি সরাসরি দেখতে পাবেন না। অতএব, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য কোন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। যাকে নিকট থেকে দেখলে আপনার অন্তরে তাঁর ভালবাসা উথলে উঠতে পারে এবং এই ভালবাসা এমন হতে হবে যে, এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসার ফলশ্রুতিতে আপনার হৃদয়কে জয় করে নিবে। এটি **এমন একটি বিষয় যা আজও গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের মধ্যে যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গুণাবলী বিদ্যমান না হয় অর্থাৎ এমন গুণাবলী যদ্বারা আপনাদের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখা যায়। এমন গুণাবলী যদি আপনাদের মধ্যে না থাকে তবে যারা আসবে তারা যেমনই শুষ্ক আসবে তেমনই শুষ্ক চলে যাবে এবং ভবিষ্যতে জামাতের সাথে তাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে না।** যেমন, হযরত (আঃ) বলেছেন, "যেমন খালি এসেছিল তেমনই খালি হাতে ফেরৎ চলে গেছে।" "আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ এবং করুণা নবী-রসূলগণের সঙ্গে থাকলে লাভ হয়। হযরত রসূল (সঃ)-এর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বসবাস করেছেন। ফল হয়েছে এই যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন–"আমার সাহাবাদের সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন আর একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ নেই।" কত বড় প্রশংসনীয় বাক্য যে, "আমার সাহাবাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন আর যারা আল্লাহ্‌কে অন্বেষণ করে তারা যেন সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।" হযরত (আঃ) বলেছেন,–সাহাবা কেরামগণ (রাঃ) যেরূপ আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বে যে কথা আমি বল্লাম যে, তাঁদের (রাঃ) মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর রূপ ছিল। শুধু তা-ই নয় বরং যার মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভালবাসার স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছিল তাঁরা আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিলেন।

আলোকপাত করা হয়েছে যে, "এটা কি করে সম্ভব ছিল যে, এরূপ উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং তাঁরা দূরেই বসে থাকতেন।" অর্থাৎ এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, যাদের প্রশংসার কথা বলা হয়েছে যে, "তাঁদের মধ্যে কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই দেখবেন না। অথচ তারা রসূল (সঃ) থেকে দূরে বসেছিলেন এবং এই মর্যাদাও পেয়েছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য.....এই বাক্যগুলি অতি সাবধানে বিবেচনা করবেন। যদি এই বাক্যের সঠিক অর্থ বুঝতে সামান্যতম ভুল হয়ে যায়, তবে একজন শিরকে পতিত হতে পারে। সুফীবাদের যতগুলো আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল সবগুলো শেষকালে গিয়ে শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছে। ঐসব বুযর্গানে দীন, যাঁদের দেখে এক যুগে মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেছে, পরবর্তীকালের মানুষ তাঁদেরকে

দেখে তাঁদের স্মরণে নিমগ্ন হয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা যারা স্মরণ করেনি তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে বরং ঐ বুযর্গকে স্মরণ করে তাঁর স্মরণে মগ্ন থেকেছেন এবং আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছেন। এখানে আঁ হযরত (সঃ) যেসব বুযর্গানের কথা প্রকাশ করেছেন এঁদের মধ্যে আল্লাহ্ বিরাজমান তারা এমন হবেন যে, তাঁদের দেখে কোন বান্দার বুযর্গীর কথা মনে আসতো না বরং আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হত। যত সাহাবা কেরাম (রাযিঃ) ছিলেন তাদের দেখে এমন হতো না যে, কোন একজন সাহাবীকে দেখে অন্য একজন সাহাবী তার ভালবাসায় বিভোর হয়েছেন। আর একজনকে দেখে অন্য একজন বিভোর হয়েছেন। বরং সকল সাহাবী এরূপ ছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর বিদ্যমান ছিল। যেমন হুযূর (সঃ) বলেছেন, "আসহাবী কাননুজুম [অর্থাৎ আমার সাহাবা–নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল ও আলোকময়] এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁদের দেখেই আল্লাহ্‌র সন্ধান পেয়ে যেত। সবাইকে দেখলেই আল্লাহ্‌র স্মরণ হত। সুতরাং আপনারা আল্লাহ্‌র এমন নমুনা হবেন না যে, কেবলমাত্র নিজেদের প্রদর্শন করবেন এবং সমাগতরা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাক। এমনটি হলে তারা আপনার মধ্যে না মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে খুঁজে পাবে, না আল্লাহ্‌কে পাবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র ইরশাদ–"কূনূ মায়াস্ সদেকীন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, "তোমরা সত্য অবলম্বনকারীর সাথী হয়ে যাও।" এই যে আয়াত যা আমি পড়ে শুনিয়েছি, হযরত (আঃ) এই আয়াতকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, –"কূনূ মায়াস্ সদেকীন"র আল্লাহ্‌র বাণী সাক্ষ্য দিচ্ছে, এটি একটি রহস্য যা খুব কম লোক অবহিত আছে।

বাহ্যতঃ দেখে মনে হচ্ছে সোজা কথা, "সত্য অবলম্বনকারীদের সাথে থাক"–এর মধ্যে কী এমন রহস্য লুক্কায়িত থাকতে পারে? কিন্তু হযরত (আঃ) বলেছেন, এর মধ্যে একটি বড় রহস্য আছে যা কম লোক অবগত আছে। আমি আপনাদের বুঝাতে চেষ্টা করছি যে, সত্য বা ন্যায়পরায়ণদের সাথে থাক। এর সাথে শর্ত হলো এই যে, **এমন সত্য অবলম্বনকারীদের সাথে থাকবেন যাদের দেখে যেন আল্লাহ্‌র কথা আপনাদের স্মরণ হয় এভাবে "কূনূ মায়াস্ সদেকীন–"** সত্য অবলম্বনকারীদের সঙ্গী হও– পূর্ণ হতে পারে নতুবা নয়। বাহ্যিকভাবে তাদের প্রশংসার গীত গাওয়া যেতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এর মধ্যে রহস্য আছে যা অল্প মানুষ বুঝে এই রহস্য না বুঝলে কোন লাভ হবে না। অধিকাংশ মানুষ সত্যবাদীদের ভালবাসে বলে দাবী করেন এবং বাহ্যিকভাবে প্রশংসার গীত গেয়েও থাকেন। কিন্তু সত্যবাদীদের সাথে মিলিত হতে ব্যর্থ হন যেমন বলে থাকে, চল, আমরাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হই এবং প্রশংসার যোগ্য হই। আর যদি তারা প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হতে পারে তবে তারাও প্রশংসার যোগ্য হতে পারে। সত্যবাদীদের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি হতে পারেন। তখন এদের প্রতি ইশারা করা হবে না বরং আল্লাহ্‌র প্রতি ইশারা করা হতে থাকবে।

হযরত (আঃ) বলছেন, "একজন মা'মুর মিনাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট) একই সময়ে সকল কথা বলতে পারেন না। এটি আর একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) "কূনূ মায়াস্ সদেকীন"সম্পর্কে বলেছেন, এ সম্বন্ধে আমার কখনও একথা মনে পড়ে নি সম্ভবতঃ অন্য কেউ খেয়াল করেছেন কিনা জানি না। খুবই চমৎকার বাক্য! আমি যতগুলি তফ্‌সীর দেখেছি তার মধ্যে কেউ এ কথা বলেন নি। হযরত (আঃ) বলেছেন, "একজন মা'মুর মিনাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট) একই সময় সমস্ত কথা বলতে পারেন না।" যিনি মা'মুর হন তাঁরও নিজস্ব স্বভাব নিজস্ব পৃথক অবস্থান থাকে। সব সময় তাঁর অবস্থান এক প্রকার থাকে না। কখনও এক অবস্থা কখনও অন্য অবস্থা বিরাজ করে। কখনও গভীর আধ্যাত্মিক অবস্থানে থেকে তত্ত্ব-জ্ঞান বা গভীর পবিত্র দর্শনের কথা বলেন। সুতরাং এখানে হযরত (আঃ) বলেন, 'কূনূ মায়াস্ সদেকীন' (তোমরা সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষদের সাহচর্য অবলম্বন কর) যিনি আল্লাহ্‌র সাহচর্যে থাকেন। তিনি বিভিন্ন সময় নতুন নতুন কথা বলবেন। তুমি যেন ঐ সমস্ত কথা থেকে বঞ্চিত হয়ে না পড়। এই যে কথাটি, এই কথাটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বেলায় সুন্দরভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। তিনি তাঁর বাকী অবশিষ্ট জীবন (ইসলাম গ্রহণের পর) মসজিদের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছিলেন। একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, হযরত নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত কোন বাণী থেকে তিনি যেন বঞ্চিত না হন। তাঁর জীবনের যে বড় একটি অংশ (ইসলামের পূর্বে) নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার অভাব তিনি এভাবে পূর্ণ করেছিলেন। মাত্র কয়েক বছরে তিনি আঁ হযরত (সঃ) থেকে এত বেশি কল্যাণ সংগ্রহ করে নিলেন যা কোন কোন বড় সাহাবীও করতে পারেন নি। কোন সাহাবী এত বেশি রেওয়ায়াত বর্ণনা করতে পারেন নি যা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি আঁ হযরত (সঃ) সান্নিধ্যে খুব কম সময় থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। জীবনের শেষাংশে ঈমান এনেছিলেন, মাত্র কয়েক বছর হুযূরে আকরম (সঃ)-এর সাহচর্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সদা-সর্বদা উন্মুখ থাকতেন, প্রস্তুত থাকতেন যে, কখন হুযূর (সঃ) কিছু বর্ণনা করবেন আর তিনি তা নিজের ঝুলিতে ভরে নিবেন।

অতএব, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি (মা'মুর মিনাল্লাহ্) সব সময় এক ধরনের কথা বলেন না। কখনও গূঢ় তত্ত্ব–কথা বলেন, কখনও কোন মূল্যবান কথা বলেন। যারা দূরে থাকেন– তারা অধিকাংশ কথা থেকে বঞ্চিত থেকে যান। তারপর আঁ হযরত (সঃ) দ্বিতীয় কথা বলেছেন, 'মা'মুর মিনাল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র প্রেরিত) কখনও নিজ বন্ধুদের আধ্যাত্মিক রোগ নির্ণয় করতে ওয়ায নসিহতের (হিতোপদেশ) মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা করেন। সংশোধন করেন।" অতএব যারা এমন প্রত্যাদিষ্ট মা'মুর মিনাল্লাহ্‌র নিকটে থাকে, তিনি তাদের অবস্থা দেখে ব্যবস্থা ও বিধান দান করেন। প্রত্যেক সময় এক ধরনের রোগী হয় না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার রোগী আসে। তাদের তিনি রোগ নির্ণয় করেন এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থাপত্র দেন। এখন দেখুন, আঁ হযরত (সঃ)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ বুঝবার জন্য হযরত (আঃ) কত মূল্যবান চাবি আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন।

হযরত আকদস রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে যখন কোন প্রশ্ন করা হত যে, আমাকে বলুন, আমার জন্য কি করণীয়। আঁ হযরত (সঃ) একজনকে এক নসিহত করতেন, অপরজনকে অন্য একটি নসিহত করতেন। অথচ প্রশ্নকারীর প্রশ্ন–একই ধরনের হত। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন হত, কোন্ আমল (কর্ম) সবচেয়ে উত্তম? কখনও আঁ হযরত (সঃ) উত্তর দিয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল মায়ের সেবা-যত্ন করা। অন্য সময় বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ (সংগ্রাম) করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।' এখন দেখুন, যারা ইতঃপূর্বে আঁ হযরত (সঃ)-এর হাদীস পাঠ করেছেন তারা কেউ এই মাহাত্ম্যপূর্ণ তত্ত্ব-কথা উপলব্ধি করতে পারেন নি যা আজ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদিগকে বলেছেন। হযরত (আঃ) বলছেন, আঁ হযরত (সঃ) অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থাপত্র দিতেন। যদিও বাহ্যতঃ প্রশ্ন একই ধরনের হত কিন্তু উত্তর ভিন্ন দিয়েছেন। কারণ প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তি ভিন্ন ছিলেন। তাঁর অবস্থা বিচার না করে ব্যবস্থাপত্র (উত্তর) দেয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র নির্ণয় করার এই চমৎকার তথ্য আপনিও কোথাও দেখেন নি। আঁ হযরত (সঃ) প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। কুরআন শরীফ থেকে এ কথাই জানা যায়। আঁ হযরত (সঃ) মানুষের চেহারার (কপালের) ভাঁজ দেখেই বুঝে যেতেন। কখনও কখনও

প্রশ্নকারীর প্রশ্নের পূর্বেই হুযূর (সঃ) বলতেন, 'তুমি কি এই কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছ ? তারপর উত্তর দিতেন। অতএব, মা'মুর মিনাল্লাহ্‌র (নবী) নিকটে সর্বাবস্থায় বসা দরকার যেন তিনি বিভিন্ন অবস্থায় যেসব কথা বলেন তা শুনে বুঝা যায় এবং আমল করা যায়। এভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাকওয়া এবং আমলে উন্নতির কারণ হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আজ যেমন আমি একদিনে সমস্ত কথা বলতে পারব না। এমন হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি হয়ত আজই আমার বক্তৃতা শুনে চলে যেতে পারে এবং আমার কথাগুলোর মধ্য থেকে হয়ত কোন কোন কথা তার মনের মত হবে না। এমন অবস্থায় সে তো বঞ্চিত হয়ে গেল।"

এখানে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। আমিও অনেক সময় দেখেছি যে, কোন সময় একেবারে নতুন মানুষ আসেন এবং মহফিলে যে কথা হচ্ছে সে কথাগুলো এমন হয় যে, এর মধ্যে থেকে কিছু কথা একজনের মনঃপূত হয় না। তখন যদি ঐ ব্যক্তি চলে যায় তবে হয়ত সে দিনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। যখন সে বারবার আসবে তখন আল্লাহ্ একদিন তাকে ঐ কথাই বুঝিয়ে দিবেন। একথা আমি ঐসব নবাগতদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। তারাই আমাকে বলেছেন অনেকবার যে, যখন তারা প্রথমবার এসেছিলেন, তখন অমুক অমুক কথা তাদের অন্তরে স্থান লাভ করতে পারে নি। কিন্তু তারপরও তারা এসেছেন। এক সময় আমার কোন কথা থেকে তারা ঐ আগের কথার উত্তর পেয়ে গেছেন কিন্তু তাদের অন্তরে এবার ঐ কথা এমনভাবে স্থান দখল করেছে যে, আর কখনও তা বেরিয়ে যায় নি।

এটি এমন একটি কথা যাকে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) নিজ লেখার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন "আমি আজ সমস্ত কথা বলতে পারব না। এমন হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি হয়ত আজ আমার বক্তৃতা শুনে চলে যাবে এবং আমার কোন কথা হয়ত তার ধারণার বিপরীত হতে পারে। তখন সে বঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু যারা বার বার এখানে আসে, অবস্থান করে এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন করতে থাকে, এক সময় দেখা যাবে যে, তারা আসল উদ্দেশ্যকে পেয়ে গেছে" (আল্ হাকাম ২৪ জুলাই, ১৯০২ ইং)।

"মানুষ আলো (নূর) এবং কল্যাণের মধ্য থেকে অংশ পেতে পারে না–যদি সে ঐভাবে আমল না করে, যেভাবে আমল করতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'কূনূ মায়াস্ সদেকীন' সত্যবাদী মহান পুরুষদের সঙ্গী হও। হযরত (আঃ) বার বার এই আয়াতের উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমি যখন হযরত (আঃ)-এর ব্যাখ্যা পড়েছি অবশ্যই নতুন নতুন তথ্য পেয়েছি। বাহ্যতঃ মনে হয় একই ধরনের কথা হচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে হযরত (আঃ) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন এবং এই একই আয়াতের ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তত্ত্বই বর্ণনা করেছেন যা এই আয়াতে লুক্কায়িত ছিল। হযরত (আঃ) বলেছেন, 'কথা এই যে, খামীর থেকে খামীর [রুটি তৈরীর জন্যে আটাকে প্রস্তুত করার পর খামীর তৈরী হয়] জাগ (দধির বীজ) থেকে জাগ সৃষ্টি হয়।' দেখুন এই কথাটি একটি নতুন কথা। 'সত্যবাদীদের সাহচর্য এজন্য অবলম্বন কর যেন তোমরা জাগকে দেখেছ যতক্ষণ জাগ সৃষ্টি না করা হয়, অন্য আটাতে জাগ লাগানোই যায় না। তোমরা এজন্য সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন কর, যেন সত্যবাদিতার জাগ একবার তোমাদের সত্তায় লেগে যায়। যখন এই জাগ একবার তোমাদের লেগে যাবে তখন এই জাগই জয় লাভ করবে। এভাবে বড় বড় বস্তুর উপর জাগ জয়যুক্ত হয়ে যায়। জাগ লাগার বিষয়টি এত বড় এবং এত গভীর যে, আমি সম্ভবতঃ আগেও বলেছি অথবা এই প্রথম বার বলছি যে, যদি সমুদ্রও হয় এবং তার মধ্যে একটু জাগ ফেলে দেয়া হয় অর্থাৎ এক সমুদ্র দুধের মধ্যে যদি একটু জাগ ফেলে দেয়া হয় তবে ঐ সামান্য জাগের কারণে সমুদ্রের সমস্ত দুধ দধি হয়ে যেতে পারে। আর যদি আটার সমুদ্র হয় তবে সময় লাগলেও সমুদ্রের সমস্ত আটা অবশ্যই জাগ হয়ে যাবে।

সুতরাং বিষয়টি এই যে, 'সৎ-সঙ্গ'-এর মধ্যে জয় লাভের ক্ষমতা থাকে, একটি শক্তি থাকে। সৎকর্মের মধ্যে এমন ক্ষমতা নিহিত আছে যে, যদি তুমি সৎ উদ্দেশ্যে সৎকর্মশীলদের সাথে গিয়ে বস এবং তোমার সমস্ত দেহ মন যদি সৎকর্ম বিমুখও হয়ে থাকে, নিশ্চিত জানিও যে, ঐ সৎকর্মের জাগ তোমার সমস্ত দেহ ও মনের উপর জয়যুক্ত হতে পারে, যদি তুমি আন্তরিকতার সাথে সত্যবাদী মহাপুরুষের সঙ্গে গিয়ে বসে থাক।

এখানে এই একটি তত্ত্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অসংখ্য সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। আমি অনেকবার আপনাদের বলেছি, আপনারা নিজের ভিতরের বিভিন্ন দিকগুলোর উপর কড়া দৃষ্টি দিবেন। প্রত্যেক দিক থেকে সৎকর্মশীল বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। নতুবা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারবেন না। এর আরো অনেক উপায় আছে, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আমি আপনাদিগকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি। কিন্তু এই উপায় বা পদ্ধতি আমার খুব ভাল লেগেছে, এবং এত সহজ যে, এতে কোন শক্তিই ব্যয় হয় না, কোন বিপদে পড়তে হয় না। কোন ভারী পরিশ্রম করতে হয় না। খামীর বা জাগ দিয়ে জাগ লাগানো যায়। যদি আপনি কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাথী হয়ে যান, তার ন্যায়পরায়ণতার কারণে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, আপনার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। আপনি অনুভবও করবেন না যে, কীভাবে হচ্ছে। সুতরাং যদি কেউ বিনা পরিশ্রমে বড় সহজ উপায়ে 'ন্যায়পরায়ণ' বা সৎকর্মশীল হতে চান তবে এই উপায় অবলম্বন করুন। বলেছেন, 'জাগ থেকে জাগ লেগে যায়, এই বিধান আদিকাল থেকে চলে আসছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর শুভাগমন হয়েছিল, হুযূর (সঃ)-এর সাথে নূর (আলো) এবং বরকত (কল্যাণ) সমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল, যা থেকে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অংশ পেলেন। অতঃপর জাগ লাগার নিয়মে আস্তে আস্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আরববাসীদের সকলের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হ'ল ঐ নিয়মে। নতুবা একা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কি পবিত্র চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন? অতএব, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, 'এটা এমন এক পদ্ধতি যা আদিকাল থেকে চলে এসেছে যার ফলে জাগ থেকে জাগ লেগে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) সংখ্যা লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল।

অতঃপর হযরত (আঃ) বলছেন, 'শরীয়তের গ্রন্থসমূহে প্রকৃত তথ্য [হকীকত ও মা'রেফত] এবং ঐশী জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকে। কিন্তু আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে যদি পুণ্যবান, সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন করা না হয়, তবে ঐ সব আধ্যাত্মিক বা ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের সঠিক খবর পাওয়া সম্ভব নয়।" সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন করতে হবে নিষ্ঠার সাথে, আন্তরিকতার সাথে। 'কূনূ মায়াস্ সদেকীন' (সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক) এর মধ্যে যদি সিদ্‌ক বা সত্য না থাকে তবে সত্যাবলম্বী মহাপুরুষের সাথে থাকার কোন অর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সত্যাবলম্বী মহাপুরুষের সঙ্গে বসবে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বসা এবং সত্যের পরাকাষ্ঠা ঐ মহাপুরুষের সঙ্গে থেকে লাভবান হওয়ার জন্য চেষ্টা করা তার জন্য একান্ত আবশ্যক হবে। হুযূর (আঃ) বলেছেন, 'যতক্ষণ নিষ্ঠা ও সততার সাথে, আন্তরিকতার সাথে সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্যে না থাকা হবে.....।' সুতরাং প্রকৃত ঘটনা এই যে, সত্যবাদী মহাপুরুষের সাথে যে ব্যক্তি অবস্থান নিবে তার জন্য প্রধান শর্ত হবে এই যে, সে যেন নিজে সত্যবাদী হয়, নতুবা কোন লাভ হবে না।

বাহ্যতঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে আবূ জাহল অনেক সময় বসে যেত এবং মক্কার আরো অনেক মন্দ প্রকৃতির লোক আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে বসত অথচ তারা পূর্বের চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট হয়ে মারা গেছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র মজলিসেও সবচেয়ে বড় জঘন্য মুনাফেক বসতো, তারা কোন প্রকার মঙ্গলজনক কিছু লাভ করতে পারে নি। আঁ হযরত (সঃ)-এর মজলিসে বসে শুধু তারাই লাভবান হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে সত্যের বীজ ছিল। সুতরাং হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) 'কূনূ মায়াস্ সদেকীন-এর ব্যাখ্যা করেছেন, "যতক্ষণ নিষ্ঠার সাথে সত্যকে সাথে নিয়ে সত্যবাদী মহাপুরুষের সাথে সাহচর্য অবলম্বন না করা হয়– ততক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কিছু ঐশী গ্রন্থ থেকে লাভ করা যাবে না।

এখানে কুরআন করীমকে বুঝবার জন্যও একটি পন্থা বলে দিয়েছেন। অতএব, কেবলমাত্র 'সৎ-সঙ্গ'-এর কথা বলা হচ্ছে না বরং সৎ-সঙ্গ অবলম্বনের বিভিন্নমুখী কল্যাণ লাভের কথাও হযরত (আঃ) বলছেন। যখনই হযরত (আঃ) এ আয়াতের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ও কিছু নতুন তথ্য দিচ্ছেন এ কথা পৃথিবীর অন্য কোন তফসীরে আপনি আশা করতে পারেন না। আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের পর আজ পর্যন্ত সকল যুগের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে দেখুন এসব কথা কেবলমাত্র হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জুটে নি। তিনি বলেছেন, 'শরীয়তের গ্রন্থগুলো প্রকৃত সত্য এবং ঐশী জ্ঞানের বড় বড় ভাণ্ডার। কিন্তু মানুষ এই গ্রন্থসমূহ পড়েও পথ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এই গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেই তারা মানুষকে বিপথগামী করে দেয়।

"নিষ্ঠার সাথে, আন্তরিকতার সাথে যতক্ষণ সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ প্রকৃত সত্য এবং ঐশী জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"

এইজন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন কর।" এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান সঠিকভাবে লাভ করা সম্ভব নয়।"

এখানে 'ঈমান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সিঁড়ি চড়া'–হযরত মাহদী (আঃ)-এর কথাটি বড় গভীর এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করা প্রয়োজন। মানুষ সাধারণভাবে পড়ার সময় পড়ে এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আগে চলে যায়। তারা বুঝতেই পারে না যে, এখানে কত বড় ঐশী জ্ঞান লুক্কায়িত আছে। ঈমানের সাথে সাথেই ঈমানদারদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে থাকে। যদি সে সত্য হয় এবং সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন করে তবে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে থাকা আবশ্যক। প্রতিদিন অবস্থার উন্নতি হতে থাকবে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কল্যাণসমূহ পেয়ে পেয়ে ধন্য হতে থাকবে। কখনও সে পূর্বের অবস্থায় থাকবে না। অনবরত সে অগ্রসর হতে থাকবে। একে বলে ক্রমোন্নতি।

হযরত (আঃ) বলেছেন, "সত্যবাদী ব্যক্তি যতক্ষণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমান ও আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারবে না। কেননা, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন করে তাঁর পবিত্র আত্মা, তাঁর সাথে সম্পর্কের পবিত্র বাঁধন এবং তাঁর পবিত্র দৃষ্টি থেকে সে পাথেয় লাভ করতে থাকে"।

এই যে বিষয়, এর মধ্যে আরো একটি বিষয় আমার চোখে পড়েছে। হযরত আকদস রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্পর্কে একথা কেন বলা হয়েছে যে, প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁর (সঃ) অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কূনূ মায়াস্ সদেকীন (সত্যবাদী মহাপুরুষের সাহচর্য অবলম্বন করো) কথাটি তো হুযূর (সঃ)-এর জন্যই প্রযোজ্য ছিল। হুযূর (সঃ)-এর সম্পর্ক তো সর্বদাই আল্লাহ্‌র সাথে ছিল। আল্লাহ্‌র সাথে আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্পর্ক তো সদা সর্বদাই ছিল যার ফলে আল্লাহ্‌র অগণিত (সিফাত) গুণাবলী হুযূর (সঃ)-কে নিজের দিকে প্রবল বেগে আকৃষ্ট করছিল এবং আল্লাহ্‌র ঐ গুণাবলী হুযূর (সঃ)-কে এক অনন্ত অসীম যাত্রার মধ্যে চলন্ত রেখেছিল। অথচ যারা আল্লাহ্‌র পথের পথিক তারা চলতেই থাকেন, অগ্রসর হতেই থাকেন। সুতরাং মহামহিমান্বিত বিষয় এটি, যা হযরত মাহদী (আঃ) এখানে প্রকাশ করে দিয়েছেন, ছোট ছোট ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে। যেমন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী মহাপুরুষের সাথে বস, তবে তোমাকেও সত্যবাদী হতে সচেষ্ট থাকতে হবে। তখন সত্যের সাথে সাথে তোমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির অবস্থা সৃষ্টি হবে।

যতক্ষণ তুমি ঐ সত্যবাদী মহাপুরুষের সুন্দর গুণাবলীকে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে। একজন সত্যবাদী মহাপুরুষ যদি অগণিত গুণাবলীর অধিকারী না হন, কারণ তিনি তো তখনই 'সাদেক' (সম্পূর্ণরূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) হতে পারেন যখন তাঁর সম্পর্ক আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে সুদৃঢ় ও সম্পৃক্ত [অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীও অগণিত হয়ে যায়]। এখানে তার একটি স্তর হল রাস্তার মাঝে সে থেমে যায় না। সে আরো আগে অগ্রসর হয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহচর্য অবলম্বনের জন্য আপনাকে নিয়ে যায় এবং হুযূর (সঃ)-এর সাহচর্য এমন যেন আল্লাহ্‌র সাহচর্য সুতরাং ইসলামের মধ্যে সীমাহীন, অনন্ত উন্নতির রাস্তা খুলে দেয়া হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি নতুন রাস্তার দিশা দিয়েছেন এবং এর প্রত্যেকটি পথ সহজ এবং সম্পূর্ণও।

অতএব, আপনারা সবাই মজলিসে শূরার মেম্বার হয়েছেন অথবা শূরার মাধ্যমে আমার বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেয়েছেন অর্থাৎ **সমস্ত পৃথিবীর আহমদী ভাইদের আমি হিতোপদেশ দিচ্ছি আপনারা 'কূনূ মায়াস্ সদেকীন' (সৎ-সঙ্গ অবলম্বন কর)-এর শিক্ষাকে শক্ত হাতে ধরুন। কিছু কথা যা বাকী থাকল তা ইনশাল্লাহ্ আগামী খুতবায় বলব। কিন্তু যতদূর বলেছি তা-ও অনেক হয়েছে। এত হয়েছে যে, আপনারা যদি এ সমস্ত কথার উপর আমল করেন তবে আপনার সমস্ত জীবন সফল হয়ে যাবে, সার্থক হবে। নব দীক্ষিতদেরও এসব কথা ভালবাসার মধ্য দিয়ে বুঝাবেন। তখন আল্লাহ্‌র ফযলে কুরআনের তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝতে আরম্ভ করবেন। কেননা, কুরআন শরীফের তত্ত্ব-জ্ঞান (মা'রেফত) আঁ হযরত (সঃ)-এর জীবনের কর্মকাণ্ড এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যকে না বুঝে অর্জন করা সম্ভব নয়।** তারপর আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে আপনি কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা নিজ পসন্দমত করবেন না যেমন আজকালকের হতভাগ্য আলেমরা করছেন। বরং কুরআন শরীফের প্রত্যেক ব্যাখ্যাকে আঁ হযরত (সঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলীর আলোকে পরীক্ষা করে দেখবেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর উত্তম আদর্শ, পবিত্র আদর্শ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করবে। ভুল ব্যাখ্যা হুযূর (সঃ)-এর অনুপম জীবনাদর্শের কাছে দিয়েও যেতে পারবে না। আর সঠিক ব্যাখ্যাগুলো ঠিক ঠিক আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্মল আদর্শের সাথে হুবহু খাপ খেয়ে যাবে। সুতরাং আজ যখন বিদ্যাবুদ্ধির যুগ, আমাদের সবাইকে পৃথিবীর সামনে কুরআনের জ্ঞানকে সুপ্রসারিত ও বিস্তৃত করতে হবে। এরজন্য উত্তম উপায় হচ্ছে "কূনূ মায়াস্ সদেকীন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে তৌফীক দান করুন।

[আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল–লন্ডন-এর ১৯ জুন–২৫ জুন' ৯৮ ইং]

অনুবাদ–মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
সদর মুরব্বী

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)

(২৪তম কিস্তি)

ইসলামী বিপ্লব :

মোটকথা এসব উত্থান-পতনের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বের জ্ঞান, উহার চেষ্টা-সাধনা, উহার দর্শন, উহার আবেগ, উহার ধর্ম, উহার রাজনীতি, উহার স্বভাব-চরিত্র, উহার কৃষ্টি, উহার সামাজিকতা, উহার অর্থনীতি আর উহার সভ্যতা সর্বৈব পরিবর্তন করে দিলো। এবং বিশ্ব ওলট-পালট হয়ে গেলো। আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে দিলেন।

ইসলাম ও অন্য ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যের আসল কারণ :

আজ ইসলাম ও ঐসব ধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য দৃশ্যমান হয় ইহা এ কারণে নয় যে, এ সাদৃশ্যের বিষয়াবলী ঐসব ধর্মে প্রথম থেকেই বিরাজমান ছিলো। বরং এ কারণে যে, ইসলামের সাথে মিলে-মিশে তারা ইহার কতক শিক্ষাকে নিজেদের করে নিয়েছে। যেমন ধর্ম তো পৃথকই থাকলো, কিন্তু ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের বই-এর পর বই নকল করেছে। আর ঐসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তাদের প্রতি আরোপ করে নিয়েছে। যেমন ইউরোপে আজকাল এমন কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে যার মধ্যে এ রকমের চুরি ধরে দেয়া হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে আমি ইংল্যান্ড থেকে একখানা বই আনিয়েছি। এর মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করা হয়েছে এবং প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইউরোপের লোকেরা স্পেনের মুসলমানদের পুস্তক থেকে জ্ঞানকে নকল করেছে বরং লেখক এ তথ্যকে উদঘাটিতে করেছেন যে, আমি ঐসব পুস্তকের উদ্ধৃতি দিতে পারি যেসব পুস্তক থেকে ইউরোপের লোকেরা এসব বিষয়কে নকল করেছে। এবং আরও বলেছেন যে, এ মুর্খতাকে দেখ যে, বৃটিশ মিউজিয়ামে (যাদুঘর) অমুক নম্বরে অমুক পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে অমুক পাদ্রীর নামে একটি পত্রের কথা বলা হয়েছে যা কিনা কোন একজন খৃষ্টান তাকে লিখেছিল যে, পাদ্রী সাহেব, মুসলমানরা সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী আর সে তুলনায় আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা খুব বিশ্রী মনে হয়। আমি চাচ্ছি যে, তাদের বিদ্যাকে ইউরোপের লোকদের জন্যে অনুবাদ করে দিই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, পাছে মুসলমানদের জ্ঞানকে নকল করলে পাদ্রীদের পক্ষ থেকে আমার ওপরে কুফরীর ফতোয়া না লেগে যায়। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি? যদি এ জ্ঞান নকল করে নেয়া যায় তাহলে এথেকে গীর্জার খুব উপকার হবে। বিশপ সাহেব এর জবাব এই দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই জ্ঞানকে নিজেদের পুস্তকে নকল করে নাও। কিন্তু একটি কথার প্রতি দৃষ্টি রাখবে আর ইহা এই যে, যদি তোমরা নীচে উদ্ধৃতি দাও তাহলে লোকেরা জেনে যাবে যে, এ জ্ঞান আরবদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছে আর এভাবে আমাদের ধর্মের অনুসারীদের অন্তরেও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অতএব তুমি নিঃসন্দেহে নকল করো কিন্তু উদ্ধৃতি দিবে না, যেন লোকেরা মনে করে যে, এ জ্ঞানের কথা তুমি নিজের থেকে বর্ণনা করছো। সুতরাং সে লিখছে যে, ঐ পত্র আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এভাবে প্যারিস শহরে ১৯৪০ সন পর্যন্ত ইব্নে রুশদের দর্শন পড়ানো হত। কিন্তু নামে কিছুটা পরিবর্তন করে দেয়া হতো যেন লোকেরা ইহা জেনে না ফেলে যে, ইহা মুসলমানের দর্শন। মজার গল্প আছে এই বলে যে, রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, ভবিষ্যতে দর্শনের এই পুস্তক যেন না পড়ানো হয়। বরং অমুক বই যেন পড়ানো হয়। কেননা, এখন দর্শন অনেক উন্নতি লাভ করেছে। তখন পাদ্রীরা কুফরীর ফতোয়া দিয়ে দিলো এবং বল্লো যে, ইহা অধার্মিকতার কাজ। সুতরাং এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও তাদের ইহা থাকলো না যে, উহা একজন মুসলমানের রচিত পুস্তক। বরং তারা ইহা মনে করতে লাগলো যে, ইহা কোন খৃষ্টানের পুস্তক। আর যদি এর স্থলে এখন আর কোন দর্শনের পুস্তক পড়ানো হয় তাহলে ইহা কাফেরের কাজ বলে গণ্য হবে।

আমাদের লোকেরা অজ্ঞাত কারণে সাধারণভাবে ইহা বলে থাকে যে, এ কথাও খৃষ্টানদের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে আর ঐ কথাও। যদিও মুসলমানগণ জাতি হিসেবে খৃষ্টানদের কাছ থেকে কোন কথা ধার করে নি। কিন্তু খৃষ্টানগণ মুসলমানদের নিকট থেকে জাতীয় সত্তার ভিত্তিতে জ্ঞান ধার করেছে কিন্তু যেহেতু মুসলমানগণ এখন ঐসব জ্ঞান বিস্মৃত হয়ে বসেছে এবং খৃস্টানগণ স্মরণ রেখেছে বরং উহাদের মধ্যে যুগের উন্নতির সাথে সাথে উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং উহার আকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে এ জন্যে মুসলমানগণ (তাদের নিজেদের জিনিস) চিনতে পারছে না আর এখন তো অমনোযোগিতার এ যুগ যে, মুসলমানদের মধ্যে না ধর্ম অবশিষ্ট আছে না সচ্চরিত্র, না কৃষ্টি অবশিষ্ট আছে আর না রাজনীতি, না সভ্যতা অবিশিষ্ট আছে না ভদ্রতা। অতএব পাশ্চাত্যই পাশ্চাত্য অবশিষ্ট আছে যা কিনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। যদিও এসব কথা কুরআন মজীদে মজুদ আছে, যদ্বারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ উন্নতি সাধন করেছিলো এবং যদ্বারা বর্তমান কালের মুসলমানগণ উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু কুরআনকে তো তারা (গিলাফে) আচ্ছাদন করে রেখে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের দিকে চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে যেভাবে পাখীর ছানা বসে বসে মায়ের আসার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাদের দৃষ্টান্ত অবিকল এমনই যেভাবে বলা হয় যে, ইরানের বাদশাহ একবার হিন্দুস্তানের আমের প্রশংসা শুনলেন। তার মনে আম খাবার সাধ জাগলো। বাদশাহ হিন্দুস্তানে তার দূত পাঠালেন যেন আম নিয়ে আসা হয়। যখন সে এখানে পৌঁছলো তখন আমের মৌসুম শেষ। কিন্তু বাদশাহ ইহা মনে করে যে, ইনি ইরানের বাদশাহের দূত এবং বহুদূর থেকে এসেছেন। তাই তিনি দিল্লী ও এর আশেপাশে জোরেশোরে অন্বেষণ করালেন, পরিশেষে বহু খোঁজাখুঁজি ও চেষ্টা প্রচেষ্টার পরে একটি বারো মাসি আম পাওয়া গেল। কিন্তু ইহা ছিলো খুবই টক এবং আঁশযুক্ত। বাদশাহ ঐ দূতকে ডেকে বললেন, আমের আকৃতি আপনি দেখে নিন। আমের আকৃতি এরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাদ যদিও খুবই মিষ্টি হয় কিন্তু এই যে আম পাওয়া গেছে ইহা সেরকম ভাল নয়। কিন্তু যেহেতু আপনাকে এখন ফিরে যেতে হবে তাই এর একটু স্বাদ গ্রহণ করে যান, যেন আপনি বাদশাহের সমীপে

আমের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারেন। তিনি স্বাদ নিয়ে দেখলেন যে, ইহা খুব টক ও বিস্বাদ। যখন তিনি ফিরে গেলেন এবং ইরানের শাহ্ তাকে আম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন তখন বল্লেন, আমার হিন্দুস্তানীদের আকল-বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কেন? তিনি বললেন, তারা আমের বড়ই প্রশংসা করে আর আপনিও আমাকে আমের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু আমি যে আমের স্বাদ গ্রহণ করে এসেছি এর বিবরণ আপনি এ জিনিস থেকে অনুমান করতে পারেন। একথা বলে তিনি একটি পেয়ালা উপস্থাপন করলেন যার মধ্যে তেতুলের আঁশ ও কিছু পানি ছিলো। বাদশাহ ইহা দেখে খুবই আশ্চার্যান্বিত হলেন। আর তিনি বল্লেন যে, হিন্দুস্তানীরা এমন বাজে জিনিসের এত প্রশংসা করে থাকে?

আজকাল মুসলমানদের অবস্থাও ইহাই। তারা কুরআন করীমের জ্ঞান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেছে ; বরং কুরআন করীম তাদের নিকট একটি মৃত পুস্তকে পরিণত হয়েছে। আর এখন তাদের সামনে যা কিছু রয়েছে উহাকে এবং কুরআন করীমকে অবলীলায় তারা একই মর্যাদা দিয়ে থাকে। তারা উন্নত মানের ও স্বাদযুক্ত আমকে পানিতে সিক্ত তেতুল মনে করে। যদিও সর্বপ্রকার সৌন্দর্য ইসলামের মধ্যে রয়েছে। সকল প্রকার কল্যাণ ইসলামে রয়েছে। আর ইউরোপ মৌলিক জ্ঞানের যা কিছু শিখেছে- ইসলাম ও মুসলমানদের নিকট থেকে ধার করে শিখেছে। কিন্তু মুসলমানরা যেহেতু ইহা অবহিত নয় তাই তারা পাশ্চাত্যের প্রেমিক বনে গেছে। (চলবে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

হাকীকাতুল ওহী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পারিবে যে, পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়াতকে তোমরা যেরূপে শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছ, বুদ্ধি-জ্ঞান ও ন্যায়বিচার এই কথা বলে না যে, তোমরা অবশ্যই এইরূপ কর। কেননা, ঐগুলি সব ধারণার সমাবেশ, যাহাতে মিথ্যার সম্ভাবনাও আছে এবং যাহা ব্যাখ্যা সাপেক্ষও বটে। অতএব নিজেদের প্রাণের উপর দয়া কর। বিশ্বাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? ধারণা কি বিশ্বাসের সমতুল্য হইতে পারে? ইহা কি সম্ভব নহে যে, তোমরা যে সকল রেওয়ায়াতকে সঠিক মনে কর সেগুলি সঠিক নহে, অথবা ঐগুলির অন্য অর্থ আছে? সকল লক্ষণের উপর জিদ করিবার দরুন ইহুদীদের উপর যে বিপদ আসিয়াছিল, উহা কি তোমাদের উপর আসিতে পারে না? অতএব তোমরা তাহাদের ভ্রান্তি হইতে উপকার গ্রহণ কর। স্মরণ রাখ, কুরআন করীমের নিশ্চিত দলিল-প্রমাণের ভাষ্য হইতে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ঈসা আকাশে জীবিত বসিয়া আছেন ; বরং তাঁহার মৃত্যু প্রমাণিত হয়। অতএব যাহাকে কুরআন মারিতেছে, তাহাকে তোমরা কেন জীবিত বল? নবী আকাশে তো জীবিত আছেন। কিন্তু সকলের একইরকম জীবন। ঈসার জন্য কোন অস্বাভাবিক জীবন নাই। আমাদের নবী (সঃ) সকলের চাইতে অধিক ঐশী জীবনের অধিকারী। সূরা নূর মনোযোগ সহকারে পড়। উহাতে ইহাই দেখিতে পাইবে যে, আগমনকারী সকল খলীফা এই উম্মতের মধ্য হইতেই হইবেন। যেক্ষেত্রে ইহুদী এই উম্মতের মধ্য হইতেও সৃষ্টি হইবে, সেক্ষেত্রে তোমরা কেন অবাক হইতেছ যে, মসীহ মাওউদও এই উম্মতের মধ্য হইতেই হইবেন। আমার কবে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি মসীহ মাওউদ হই? যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষাই হইত তবে আমি বরাহীনে আহমদীয়ায় আমার পূর্বের বিশ্বাসের ভিত্তিতে কেন লিখিলাম যে, মসীহ আকাশ হইতে আসিবেন? অথচ ঐ বরাহীনেই খোদা আমার নাম ঈসা রাখেন।

অতএব তোমরা বুঝিতে পার, আমি পূর্বের বিশ্বাসকে ছাড়ি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট ইলহাম সহকারে দাঁড়াইলেন। অতএব আমি বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের ধারণা-প্রসূত রেওয়ায়াতকে কীভাবে গ্রহণ করিতে পারি এবং অন্তর্দৃষ্টিকে ছাড়িয়া ধারণা-ভিত্তিক আনুমানিক কথা গ্রহণ করিতে পারি? এইগুলির বাতিল হওয়াকে খোদা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যেভাবে ইহুদীদের রেওয়ায়াত ও হাদীসের বাতিল হওয়াকে খোদা হযরত ঈসা ও আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অতএব ঐ অন্তর্দৃষ্টি, যাহা শক্তিশালী নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে দেওয়া হইয়াছে, আমি উহাকে কীভাবে পরিত্যাগ করিতে পারি? খোদা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, ঐ সবগুলি রেওয়ায়াত সঠিক ছিল না ; কিছু তো সঠিক ছিল, যাহা কুরআন শরীফ মোতাবেক এবং কিছু আবর্জনা ও দুর্বলতার ভাণ্ডার ছিল। ইহাদের ভুল হওয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিছু সহী হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ছিল। যদি এইরূপ না হইত তবে মসীহ মাওউদের 'হাকামান' (মীমাংসাকারী) নাম কেন রাখা হইল? কেননা, যদি মসীহ মাওউদের কর্তব্য হয় যে, তিনি আবির্ভূত হইয়া সকল রেওয়ায়াত মানিয়া নিবেন, তবে কোন্ অর্থে তাহাকে 'হাকামান' বলা যাইতে পারে? প্রত্যেক বৃক্ষকে উহার ফল দ্বারা সনাক্ত করা হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক দাসের সম্মান তাহার প্রভুর অনুগ্রহের দ্বারা জানা যাইতে পারে। প্রত্যেক সুগন্ধ নিজের সাক্ষ্য নিজেই দেয়। অতএব কেন আমার সহিত বাড়াবাড়ি করিতেছ? কেন মুখের অপবিত্রতাকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌছাইতেছ? ধৈর্য ধর এবং তাকওয়ার সহিত কাজ কর। যদি আমি সত্যবাদী না হইয়া চোর ও দস্যুর ন্যায় হই, তবে কত দিন পর্যন্ত এই চুরি ও দস্যুতা চলিতে পারে?

... ...

এখন আমি নিদর্শনাবলী এখানেই শেষ করিয়া দোয়া করিতেছি যে, খোদাতাআলা অনেক অনেক আত্মা এইরূপ সৃষ্টি করুন যাহারা এই সকল নিদর্শন হইতে উপকৃত হইবে এবং সত্যের পথ গ্রহণ করিবে ও হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! আমার বিনীত দোয়া শ্রবণ কর এবং এই জাতির কর্ণ ও হৃদয় খুলিয়া দাও এবং আমাকে ঐ সময় দেখাও যখন মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনা পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে এবং নিষ্ঠার সহিত তোমার উপাসনা করা হইবে এবং পৃথিবী তোমার ধার্মিক ও একত্ববাদী বান্দাদের দ্বারা এইরূপে ভরিয়া যাক যেরূপে সমুদ্র পানি দ্বারা ভরপুর এবং তোমার রসূল করীম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মাহাত্ম্য ও সত্যতা হৃদয়সমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাক, আমীন।

হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! আমাকে এই পরিবর্তন পৃথিবীতে দেখাও এবং আমার দোয়াসমূহ কবুল কর, যাহা কবুল করিবার সকল শক্তি ও সামর্থ্য তোমার আছে। হে সর্বশক্তিমান খোদা! এইরূপই কর। আমীন। সুম্মা আমীন।

ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন।

অনুবাদ- **নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

জুমুআর খুতবা

ইসলামী আতিথেয়তা ও শিষ্টাচার

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা তাং ২৪ জুলাই, ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহে রাবে' (আইঃ) সূরা যারিয়াতের ২৫-২৭ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٥﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۚ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٦﴾

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٧﴾

অর্থ : "তোমার নিকট কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, 'সালাম' (শান্তি বর্ষিত হউক)! সে বলিল, 'সালাম'! (ইব্‌রাহীম মনে মনে বলিল) 'লোকগুলি অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে।' এবং সে নীরবে স্বীয় পরিবারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একটি মোটা-ভাজা গো-বৎস লইয়া আসিল।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আমাদের মেহমানদের আগমন ও তাদের মেহমানদারীর সন্ধিক্ষণে, জামাতকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অতিথি-পরায়ণতার সুন্নত সম্বন্ধে অবগত করতঃ তাদের কাছ থেকে উহাকে পুনর্জীবিত করার আশা রেখে এই আয়াতগুলিকে আজকের খুতবার বিষয়-বস্তু বানিয়েছি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘরে যারা মেহমানরূপে এসেছিল তারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন, তবে মানুষের বেশে। এ জন্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাদের চিনতে পারেন নি। কুরআন বলে তারা "মুকরমীন" মেহমান ছিলেন। অতীব সম্মানিত মেহমান। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে না পারা সত্ত্বেও বললেন, এরা তো বিদেশী বলে (অপরিচিত) মনে হচ্ছে। বিদেশী (অপরিচিত) হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতিথিপরায়ণতার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেন।

এবারের জলসায় অনেক পরিচিত ও অপরিচিত মেহমানদের সমাগম ঘটবে। যারা অপরিচিত তাদের একটি অধিকার রয়েছে। যারা বাড়িতে মেহমানরূপে আসেন অথবা বিভিন্ন স্থানে জামাতের মেহমান হয়ে আসেন তাদেরকে জিজ্ঞেস না করে যে, আপনারা খেয়েছেন কি না? কোন কিছু পরিবেশন করা ইব্‌রাহীমি সুন্নত। অনেক সময়ে মেহমানকে জিজ্ঞেস করে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়া হয়। অনেক সময় মেহমানকে মিথ্যা বলতে হয়। সে মনে করে তার বলাতে সে (আপ্যায়নকারী) কষ্টে পড়বে তাই বলে যে, না আমি খেয়ে নিয়েছি। আমি জামাতের কাছ থেকে আশা করি যে, তারা কখনও কোন আঙ্গিকে মিথ্যা বলবে না। আর না খেয়ে থাকলে তার এই বলা যে, খেতে দিন– তাকে লজ্জায় ফেলে দেয়। মনে করে তার এই বলা যে, কিছু খেয়ে আসিনি মেযবানের (যে অতিথিকে আপ্যায়ন করে) কষ্ট হবে। দেখুন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি। খেয়েছেন কিনা এটাও জিজ্ঞেস করেন নি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘরে গেলেন এবং একটি ভূনা (রোস্ট) গো-বৎস নিয়ে আসলেন। যখন (মেহমানগণ) গো-বৎসের হাত লাগায়নি (অর্থাৎ খায়নি) সে সময়ে কুরআনের অন্যান্য কয়েকটি আয়াত হতে জানা যায় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ভীত হয়ে পড়লেন। কেননা, অনেক জায়গায় এই রীতি রয়েছে যে, মেহমান যদি খাবার পরিবেশন করার পর তা না খায় তবে ইহার অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে যে, আগমনকারীর কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এসেছে। এখানে এর বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে "কাওমুম মুনকারুন"–এতে হয়ত ইহার ইঙ্গিত রয়েছে।

যাই হোক আমাদের মেহমান যারা আসছেন তারা সবাই সম্মানিত। কেননা, তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান। খুতবার পরবর্তী অংশে আমি হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে কিছু রেওয়ায়াত উপস্থাপন করব এবং আপনাদের কাছ হতে আশা করবো যে, **আপনারা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আদর্শকে অনুকরণ করে মেহমানদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করবেন।** কিন্তু সর্বাগ্রে আমি অতিথিপরায়ণতা সম্বন্ধে কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি। মুসনাদ আহমদ হতে বর্ণিত। "তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য ইহা আবশ্যকীয় যে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।" অত্যন্ত গভীর বিষয়-বস্তু ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। ইহার অর্থ হলো, যে আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে তার জন্যেও এক আপ্যায়নের ব্যবস্থা হবে। আর উহা করবেন আল্লাহ্‌তাআলা। সুতরাং **যে আল্লাহ্‌তাআলার বান্দাদের সাথে উত্তম অতিথিপরায়ণতার ব্যবহার করে সে আশা রাখতে পারে যে, তার খোদা তার সাথে উত্তম অতিথিপরায়ণতার ব্যবহার করবেন।** এ কথাটি উক্ত হাদীসের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এজন্য বলা হয়েছে, "সে যেন অবশ্যই মেহমান নেওয়াযী (অতিথিপরায়ণতা) করে। এবং একদিন রাত হতে তিন দিন রাত পর্যন্ত যেন তাকে মেহমান রাখে।" ইহা তো মেহমানের অধিকার। কেননা, মুসাফির তিন দিনের জন্যে মুসাফির বলে গণ্য হয়ে থাকেন। প্রত্যেক মেহমানকে ন্যূনতম এই অধিকার দেওয়া উচিত যে, সে যেন তিন দিন পর্যন্ত আপনাদের নিকট থাকতে পারে, যাতে করে আপনারা তার মেহমান হবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তিনি (সঃ) বলেন, "যদি এর অধিক সময় মেহমান তার নিকট থাকে ও সে তার মেহমান নেওয়াযী করে তবে ইহা তার তরফ হতে সদকা ও পুণ্য বলে গণ্য হবে। তাই তিন দিন পর মেহমানকে বের করে দিকে হবে তা বলা হচ্ছে না; বরং বলা হচ্ছে (তিন দিন রাখা) তো অবশ্য পালনীয়। ইহা পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ইহা তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। কিন্তু ইহা ছাড়া তোমরা যদি নফল দ্বারা উপকৃত হতে চাও পুণ্য করতে চাও তবে মেহমানকে বেশীদিন থাকতে উৎসাহিত কর। অর্থাৎ নিজের ব্যবহার দ্বারা। তার সাথে এমন ব্যবহার কর যেন সে আরো কিছুদিন থেকে যায়। ইহার বিপরীতে মেহমানের কিছু দায়িত্ব আছে। তিনি (সঃ) বলেন, "মেহমানের জন্য অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তিন দিনের অধিক থাকা উচিত নয়।" দুইজনের (মেহমান ও মেযবান) দায়িত্ব, দুইজনের কর্তব্য সম্বন্ধে দুইজনকেই বলা হয়েছে। (তিনি (সঃ) বলেছেন) "এবং মেযবানকে (অতিথি সেবক) বিপদে না ফেলে।" ইহার অর্থ হলো অতিথি সেবক

লৌকিকতায় এরূপ বলে থাকেন এবং মেহমান যেন স্পষ্টভাবে বলে দেয় আমার যতদিন থাকার প্রয়োজন ছিল তা থেকে নিয়েছি।

এ জলসায় পাকিস্তান হতে আগত মেহমানদের জন্যে তিনদিন নয় বরং যুক্তরাজ্যের জামাত পনর দিনের জন্য মেযবানীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এজন্য ঐসকল মেহমান যারা বিদেশ হতে এসেছেন তারা এখানে পনর দিনের মেহমান হিসাবে গণ্য হবেন। কেউ যদি অন্য কারও নিকট থাকেন সেখানেও এই পনর দিন প্রযোজ্য। কেননা, তারাও জামাতের অংশ। প্রত্যেকের উপর কিছু না কিছু জামাতী কর্তব্য অর্পিত আছে। এমন প্রত্যেকেই জামাতের প্রতিনিধিত্বে অতিথি সেবা করে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন ব্যক্তিদের নিকট চৌদ্দদিন পর্যন্ত থাকতে পারেন। তবে তা হবে অতিথি সেবকের সম্মতিক্রমে। যদি এমনটি না হয় তবে তিন দিন পর জামাতের অতিথি সেবার নেযামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এ ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, আগমনকারী মেহমানদের মন-মেজায ও অবস্থানুযায়ী জামাত বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করেছে। তবে মৌলিকভাবে সম্মানের হক সবাই রাখেন। প্রক্যেক মেহমানের সম্মান হওয়া উচিত।

আরেকটি হাদীস উপস্থাপন করছি যা বুখারী কিতাবুল বির্ হতে নেওয়া হয়েছে। হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, "আঁ হযরত (সঃ) বর্ণনা করেছেন, নগণ্য পুণ্যকেও অবজ্ঞা কর না। নিজ ভাইয়ের সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত।" ইহাও অতিথি সেবার ধরন। **আগমনকারী সরাসরি আপনার মেহমান হোক বা না হোক তার সাথে ভাল ব্যবহার করবেন। জলসাতে যেন সবাই সবাইকে হাস্য বদনে সাক্ষাৎ করেন। এ চিত্রটি যেন সর্বত্র ফুটে ওঠে।**

ইবনে মাজা হতে একটি হাদীস পাঠ করছি যা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, "আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের নিকট কোন জাতির নেতা বা সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করে তখন তার মর্যাদানুযায়ী তাকে সম্মান ও আপ্যায়ন কর।" এ হাদীসটি আমি এজন্যে পাঠ করা জরুরী মনে করছি যে, এবার দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান হতে এমন মেহমান আসছেন যারা আহমদী নন। তাদের জন্য যে ভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও তাদের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় এ পরিপ্রেক্ষিতে যেন কেউ ইহা মনে না করে যে, কিছু মেহমানের সাথে তো সাধারণ ব্যবহার করা হচ্ছে।

আসলে এ বিশেষ ব্যবস্থা ও আচরণ আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশনানুযায়ীই হয়ে থাকে। উপরোক্ত হাদীসটি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য বহন করে যে, যখন কোন জাতির বিশেষ ব্যক্তি বা সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটে তখন তার মর্যাদানুযায়ী তার সাথে ব্যবহার কর। কেননা, তিনি তার গোটা জাতির প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। তিনি তার জাতিকে ফেরৎ গিয়ে বলবেন যে, তার সাথে কী ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন যে হাদীসটি পাঠ করছি তা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল হতে নেওয়া হয়েছে। "হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তোফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট অধিক হারে মেহমানের আগমন ঘটতে লাগলো তখন তিনি (সঃ) বলতেন, প্রত্যেকে তার মেহমান যেন নিয়ে যায়।" ইহা ঐ হাদীস নয় যা এর পূর্বে কয়েকবার বর্ণনা করেছি। ইহা তদ্সদৃশ্য একটি হাদীস। এমন অবস্থা তখন প্রায়ই ঘটত। ইহা প্রতিনিয়ত ঘটত। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে আঁ হযরত (সঃ) বলতেন যে, যার যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার মেহমান নিয়ে যায়। "হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তোফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি তাদের অন্তরঙ্গ ছিলাম যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে গিয়েছিলেন।" অর্থাৎ একদা মেহমানদের আধিক্যের কারণে মেহমানদের সঙ্গে নিয়ে যাবার লোক কম ছিল। তাই আঁ হযরত (সঃ) মেহমানদের সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলতে শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন তোফা (রাঃ) বলছেন, আমি তাঁর (সঃ) সাথে ছিলাম। "তিনি (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বল্লেন, হে আয়েশা! খাবার জন্যে কিছু আছে কি? তিনি (রাঃ) বল্লেন, হবেয়সা (আরবের এক প্রকার খাবার) আছে। ইহা আমি আপনার ইফতারের জন্য প্রস্তুত করেছি। [অর্থাৎ তিনি (সঃ) রোযা ছিলেন] আঁ হযরত (সঃ)-এর কথার প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) খাবারটি একটি পাত্রে ঢেলে আনলেন। সেই পাত্র হতে আঁ হযরত (সঃ) কিছু নিয়ে খেলেন।" অর্থাৎ তিনি (সঃ) ইফতার করতে দেরী করলেন না। সাধারণতঃ তিনি (সঃ) মেহমানদের আগে খেতেন না, কিন্তু ইফতারের সময় হবার কারণে তিনি তা খেলেন। "তিনি (সঃ) পাত্র হতে কিছু নিলেন এবং খেলেন। অতঃপর তিনি (সঃ) বল্লেন, 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাও।" 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাবার আদেশ অন্যান্যদের দিয়েছেন। তিনি (সঃ) তো 'বিসমিল্লাহ্' বলেই খেয়েছিলেন। "সুতরাং আমরা (বর্ণনাকারী) ঐ খাবার এভাবে খেলাম যে, আমরা খাবারের দিকে তাকাইও নি। পরবর্তীতে আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, হে আয়েশা! তোমার নিকট পান করার জন্যে কিছু আছে কি ? তিনি (রাঃ) বল্লেন, হ্যাঁ, আছে। হারীরা আছে। (পাতলা হালুয়া যা খেতে খুব সুস্বাদু)। ইহা আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত করেছি। তিনি (সঃ) বল্লেন, নিয়ে আসো। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহা নিয়ে আসলেন। আঁ হযরত (সঃ) পাত্রটি ধরে মুখের কাছে তুল্লেন এবং তা হতে কিছু পান করলেন। অতঃপর তিনি (সঃ) বল্লেন, বিসমিল্লাহ্ বলে পান করো।" **দু'টি বিষয় এখানে মনে রাখার যোগ্য। প্রথমতঃ ইফতারের দেরী করা সমীচীন নয়। দ্বিতীয়তঃ দুইবারই তিনি (সঃ) সর্বাগ্রে খেয়েছেন। আর ইহা অবশ্যই বরকত পাবার জন্য ছিল।** বাস্তবে অনুরূপই ঘটেছিল। (বর্ণনাকারী বলছেন,) "অতঃপর আমরা উহা এভাবে পান করছিলাম যে, আমরা তা লক্ষ্য করছিলাম না (অর্থাৎ অল্প হবার কারণে উহা দেখছিলাম না যাতে করে শেষ হবার প্রাক্কালে থেমে যেতে হয়) আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পান করলাম যতক্ষণ না আমরা সবাই তৃপ্ত হলাম। ইহার পর তিনি (সঃ) ঘরের ভিতরে গেলেন এবং অল্পক্ষণেই ঘর হতে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। আমরা মসজিদে শায়িত ছিলাম। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে আঁ হযরত (সঃ) যখন মসজিদে আসলেন তখন তিনি (সঃ) সবাইকে 'আস্সালাত' (নামায) 'আসসালাত' বলে জাগাতে লাগলেন।" **মেহমানদের নামাযের জন্য জাগ্রত করাও একটি সুন্নত।**

আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত ছিল যে, যখন তিনি নামাযের জন্য আসতেন তখন লোকদিগকে নামাযের জন্য ডাকতেন। সাহাবী (রাঃ)-এর এই কথা বলা যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) নামাযের জন্য ডাকলেন ইহা তার কোন অকস্মাৎ আমল ছিল না। বরং ইহা তাঁর (সঃ) নিয়ম ছিল। [সাহাবী (রাঃ) বলেছেন] "যখন তিনি (সঃ) আমার কাছে জাগ্রত করার জন্য আসলেন তখন আমি উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? আমি বল্লাম, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন তোফা। তিনি (সঃ) বল্লেন, এভাবে শায়িত হওয়াকে আল্লাহ্তাআলা অপসন্দ করেন।" সুতরাং মনে **রাখেবেন উপুড় হয়ে শোয়া ঠিক নয়।** হুযূর (সঃ) ডান দিকে ফিরে শুতেন পিঠের উপর শোয়াও জায়েয। অসুস্থতার কারণে বাম দিকে পাশ ফিরেও শোয়া যায়। ইহা কোন শরীয়তের বিষয় নয় যে, ডান দিকে পাশ ফিরে শুতেই হবে। কিন্তু উপুড় হয়ে শোয়াকে আঁ হযরত (সঃ) এ জন্য অপসন্দ করতেন যে, ইহাকে আল্লাহ্তাআলা অপসন্দ করেন। ডাক্তারী মতে ইহা এক আশ্চর্যজনক সত্য যে, যে-সকল ছোট বাচ্চাদেরকে মায়েরা উপুড় করে শুইয়ে রাখেন তাদের অনেকেই এরূপ শায়িত অবস্থায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। সুতরাং ডাক্তারী মতে **ইহা এক ক্ষতিকারক বিষয়। উপুড় হয়ে শোয়া ঠিক নয়।**

আরেকটি রেওয়ায়াত পড়ছি যা হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। "হযরত উমর (রাঃ) তাঁর (রাঃ) পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) যখন সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন তখন তিনি তিনবার তকবীর বলতেন এবং এই দোয়া পড়তেন "পবিত্র সেই সত্তা যিনি ইহাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন।" আমার ধারণানুযায়ী আপনাদের মধ্য থেকে কেউ এই সফরে উটের উপর সওয়ার হন নি। যদি কেউ চড়ে থাকেন তবে তারা হবে ডেরাগাজী খানের কিছু লোক যারা গাড়ি পর্যন্ত পৌছানোর জন্যে হয়ত উটের উপর সওয়ার হয়েছেন। ইহা এক পৃথক বিষয়। যাই হোক দোয়া করেছেন বাহনের জন্যে। এই যুগের যে বাহন তা তো উটের স্থলাভিষিক্ত। "ওয়া ইযাল ইশারু উত্তিলাত" অর্থাৎ যখন উত্তম বাহনের সৃষ্টি হবে তখন উটনীদের পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে। এই আয়াত বলছে যে, এখানে উটের অর্থ হলো বাহন। [তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেন] "তিনবার তকবীর বলতেন তারপর এই দোয়া করতেন, পবিত্র সেই সত্তা যিনি ইহাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন। *সুবহানাল্লাযী সখখারালানা হাযা ওমা কুন্না লাহু মুকরিনীন।* যদিও ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রণাধীন করার আমাদের শক্তি নেই। আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। হে আমাদের খোদা! এই সফরে আমরা তোমার কাছে কল্যাণ ও তাকওয়া কামনা করি। তুমি আমাদিগকে এমন পুণ্য কর্ম করার তৌফীক দাও যা তুমি পসন্দ কর। হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের এই সফরকে সহজ করে দাও এবং ইহার দূরত্বকে কম করে দাও।" ইহার অর্থ হলো যেমন কিনা আপনারা দূর-দূরান্ত হতে উড়োজাহাজে করে এসেছেন। চেয়েছেন যে, রাস্তায় কোন কষ্ট না হোক যাতে করে দূরত্ব বেশি মনে না হয়। আসার সময় হয়ত এই দোয়া জানতেন না কিন্তু যাবার সময়তো ইহা মনে থাকবে। এজন্য ফেরৎ যাবার সময়ে কষ্ট হতে বাঁচার জন্যে এ দোয়া করবেন। "হে খোদা তুমি এ সফরে আমাদের সঙ্গী হও এবং (আমাদের) অবর্তমানে আমাদের পরিবারের খেয়াল রেখো। হে খোদা! আমি তোমার আশ্রয় চাই সফরের জটিলতা হতে, অপসন্দনীয় ও কষ্টদায়ক দৃশ্য হতে, অর্থ ও পরিবারের অকল্যাণ হতে এবং অপসন্দনীয় পরিবর্তন হতে।" কোন এমন দিক নেই যাকে হুযূরে আকরম (সঃ) এই দোয়াতে সন্নিবেশিত না করেছেন। সফরের সময় যা কিছু ঘটতে পারে ঐসব কিছুর জন্য তিনি (সঃ) দোয়া করেছেন। মঙ্গলের জন্য দোয়া করেছেন এবং প্রত্যেক অকল্যাণ হতে বাঁচতে চেয়েছেন। এমনকি পিছনে ছেড়ে আসা এবং যার দিকে ফিরে যাচ্ছেন তার জন্যেও দোয়া করেছেন। এই দোয়াতে আপনারা শুধু নিজ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না বরং দেশবাসীকেও স্মরণ রাখবেন। (দোয়া করেছেন) অপসন্দনীয় পরিবর্তন হতে। আজ পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি অপসন্দনীয় পরিবর্তন হয়ে আসছে। আপনারা যে আল্লাহ্‌র জন্যে সফর করে এসেছেন আপনাদের দোয়ার বরকতে হয়তবা ফেরৎ গিয়ে ভালো পরিবর্তন দেখবেন। শুধু নিজের পরিবারের উত্তম পরিবর্তনের জন্য দোয়া করবেন না বরং দেশবাসীর জন্যেও দোয়া করবেন। "[সাহাবী (রাঃ) বলেন] যখন তিনি (সঃ) ফিরে আসতেন তখনও তিনি (সঃ) এই দোয়াই করতেন, তবে একটু পরিবর্তনের সাথে।" আসার সময় পিছনে ছেড়ে-আসাদের জন্য দোয়া করতেন এবং ফেরৎ যাওয়া পর্যন্ত যেন এসব কিছু হয় ইহার জন্যে দোয়া করতেন। ফেরৎ যাবার পথে অনুরূপই দোয়া করতেন। তবে উহাতে কিছু অংশ বৃদ্ধি করতেন। আর তা হলো, "আমরা তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে করতে ইবাদতকারী হয়ে ও নিজ প্রভুর মহিমা কীর্তন করতঃ ফিরে এসেছি।" অতএব এ জলসাতে আপনারা যা শিখবেন উহার ফলশ্রুতিতে আপনাদের জন্যে ইহা উত্তম হবে যে, আপনারা এ সফরের দোয়াতে ইহাও অন্তর্ভুক্ত করুন যে, হে আমার প্রভু! আমরা তওবা করে, ইবাদতকারী হয়ে এবং নিজ প্রভুর মহিমা কীর্তণরত অবস্থায় তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। ইবাদতের বিষয়ের উপর আমি অনেকগুলি খুতবা দিয়েছি। কিন্তু জলসার সময় ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এ হাদীসটি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যখন ফেরৎ যাওয়ার পথে ইবাদতকারী হবার কথা বলা হচ্ছে তখন এর অর্থ হলো সফরের পূর্বে পূর্ণাঙ্গীনভাবে ইবাদতকারী ছিল না সফরের সময়ে পরিবর্তন হয়ে তার উন্নতি ঘটেছে এবং পূর্বের চাইতে উত্তম ইবাদতকারীতে পরিণত হয়েছে। এখানে ইবাদতের পদ্ধতি শিখলে পরেই তো ফেরৎ পথে এ দোয়া করতে পারবেন।

"হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে ইহা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন ঘরে বা কোন স্থানে বাস করার অথবা অস্থায়ী অবস্থান করার পূর্বে এই দোয়া করে, যে, "আমি আল্লাহ্‌তাআলার পূর্ণাঙ্গীন কলেমাতের (বাণীসমূহ) আশ্রয় গ্রহণ করছি ও ঐ অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌তাআলার আশ্রয় চাই। যা তিনি সৃষ্টি করেছেন – তবে ঐ ব্যক্তিকে ঐ ঘর বা স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোন কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারে না।" আপনারা মনে করতে পারেন এই দোয়া মৌখিকভাবে উচ্চারণ করলে কোন অনিষ্ট হবে না। এরূপ ভাবলে আপনারা ইহার মৌলিক শিক্ষাটি বুঝেন নি। "আমি আল্লাহ্‌তাআলার পূর্ণাঙ্গীন বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং আল্লাহ্‌তাআলার আশ্রয় চাই ঐ অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।" সুতরাং যে ব্যক্তি অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাইছে সে অনিষ্টকেও আশ্রয় দিবে যদি সে অনিষ্টকে আশ্রয় দেয় তবে তার পক্ষে এই দোয়া কবুল হবে না, যে সফরের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যেন তার কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু সে যদি এই নিয়্যত করে খোদার আশ্রয় চায় যে, তার দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না বা কারো ক্ষতি করবে না তবে আমার পূর্ণাঙ্গীন বিশ্বাস তাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

এখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান নেওয়াযী (অতিথি আপ্যায়ন) সম্পর্কিত অনেকগুলি রেওয়ায়াত হতে বেছে নিয়ে কয়েকটি রেওয়ায়াত তুলে ধরছি। মনে হয় আমি এগুলি এর পূর্বে তুলে ধরি নি। আর যদিও বা উহা তুলে ধরে থাকি তবে বর্তমান অবস্থায় ইহা আবার তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। সৈয়্যদ হাবিবুল্লাহ্ সাহেবকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমি আজ অসুস্থ ছিলাম এবং বাইরে আসার শক্তি ছিল না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি চিন্তা করলাম যে, ইহা (সাক্ষাৎ) মেহমানের হক যে, দূর হতে কষ্ট করে এসেছেন তাই আমি (আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে) বাইরে এসেছি।" এই রেওয়ায়াতটি তুলে ধরার পিছনে আমার কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত: এই যে, আমি অসুস্থ আছি বা নই ইহার দিকে দৃষ্টি না রেখে আগমনকারী মেহমানের সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় বের করার সর্বদা চেষ্টা করি। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, (বর্তমানে) আমি অসুস্থ নই। কিন্তু অনেক সময়ে আপনারা সহানুভূতির সাথে গভীর দৃষ্টিতে আমার চেহারায় অসুস্থতার ছাপ দেখার চেষ্টা করেন এবং বলেন আফসোস, আপনিতো অসুস্থ। এই পদ্ধতি সঠিক নয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অসুস্থ ছিলেন ও অসুস্থ থাকতেনও। কিন্তু কেউ বলতোনা যে, আপনি অসুস্থ। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবার দাবীও ইহাই। তাই আমি জামাতকে বার বার বুঝাতে চেষ্টা করি। কিছু লোকতো এতো গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করেন যে, ঐ দৃষ্টি হতে বিরক্তি অনুভব করি। তারা আমার চেহারায় এমন কোন চিহ্ন পেতে চায় যা দেখে তারা সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। যদি এরূপ কোন চিহ্ন না পায় তখন তারা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে শুরু করেন। **তোমাদের আসার উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ করার তা কর। নিজের স্বাস্থ্যের জন্য দোয়ার আবেদন করার থাকলে তা**

কর। কিন্তু আমার বিষয়ে অনধিকার চর্চা কর না। এতে করে আমার জন্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমি যখন উপস্থিত আছি তো আছি। আমি অসুস্থ হলেও তো উপস্থিত আছি। এতে আপনাদের ক্ষতি কোথায়। যদি আমার কোন অসুখ থেকে থাকে তবে উহা আমার উপর এবং আমার খোদার উপর ছেড়ে দিন। তবে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি মোটেও অসুস্থ নই। আমি সম্পূর্ণরূপে ঠিক আছি এবং পূর্বের চাইতে অনেক ভালো আছি। খোদার ফযলে বর্তমানে আমি যে নিজের উপর পরিশ্রম করছি অর্থাৎ বিশেষ খাদ্য খাই ও অন্যান্য খাদ্য হতে সংযম করি এবং নিয়মিত ভ্রমণ করি। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমার ভ্রমণ যা এক ঘন্টার হয়ে থাকে আমি অনুভব করছি যে, শক্তি ফিরে পেয়েছি এবং ঐ এক ঘন্টার ভ্রমণ আমি পয়ঁতাল্লিশ মিনিটে করে নিই। অনেক সময়ে তার চাইতে কম সময়ে করি। আর অনেক সময়তো আমার সঙ্গীদের দৌড়াতে হয়। ইহা ঐ সময়কার কথা যখন আমি এখানে নতুন নতুন এসেছিলাম। দিন দিন আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ইহাতে উন্নতি হচ্ছে। যখন আল্লাহ্‌তাআলা এত ফযল করেছেন তখন আপনাদের নাক গলানোর প্রয়োজন কিসের! আমি আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। অনেক সময় আমার কাশিও হয়ে যায়। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সব সময় কাশিতে ভুগেছেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর কাশি সম্বন্ধে আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি (রাঃ) তৎকালীন এলোপ্যাথির সকল উত্তম চিকিৎসা করিয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর সারা জীবন কাশি ছিল। যারা বেশি বক্তৃতা করেন তাদের স্বভাবতঃই কাশি হয়ে যায়। ইহা আল্লাহ্‌তাআলার ফযল যে, আমি নিজের চিকিৎসা সাথে সাথে করতে থাকি। তাই আমি অনেকটা কাশি হতে বেঁচে আছি। সেই যুগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-কে কোথায় লোকেরা এ বলে বিরক্ত করেছে যে, আপনি এখন কাশিতে আক্রান্ত। তিনি কাহওয়া (লাল চা) পান করতে থাকতেন এবং কাশি হতে থাকতো। এ বিষয়গুলিতে আপনাদের নাক গলানো উচিত নয়। ইহা হতে বিরত থাকা উচিত। আমার যদি কাশিও উঠে তবুও আমি কোন ধরনের কষ্ট বোধ করি না। বুকে অথবা গলায় কোন ধরনের ব্যথা অনুভব করি না। অধিক বলার কারণে গলায় আঁচড়ের সৃষ্টি হয় যার ফলে কাশির সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থা আমার খুবই কম হয়ে থাকে আর হলে তা হতে দিন। চিন্তার কোন কারণ নেই।

এখন হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর একটি রেওয়ায়াত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যার মধ্যে আমাদের জন্যে জলসার এ দিনগুলির সম্বন্ধে অনেকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। "তিনি (আঃ) বলেন, যদি কোন মেহমান আসে এবং সে গাল মন্দ দেয় তবে তোমাদের চুপ থাকা উচিত। সে আমাদের অবস্থা জানে না এবং সে আমার মুরীদদের অন্তর্ভুক্তও নয়। এ অবস্থায় তার কাছ হতে ঐ আদব পাবার কীভাবে আশা করতে পারে যা এক মুরীদের কাছ হতে আশা করা হয়।" এখানে দু'টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে একতো এই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তার অনুসারীদের কাছ হ'তে গালমন্দের আশা করেন না। যদি কেউ গালমন্দের সাথে আচরণ করে তবে আপনাদের মনে করতে হবে সে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মুরীদ নয়। আর দ্বিতীয়তঃ যে তার (আঃ) অনুসারী তাদের মনে রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাদের কাছ থেকে কি আশা করেন। যে (গালমন্দ) শুনছে সে যেন মনে করে সে তাঁর (আঃ) মুরীদ নয়। ধৈর্যের পরিচয় দেয়। আর যে মুরীদ সে চিন্তা করে দেখুক যে, সে কি করছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তার কাছ হতে কি আশা রাখেন। তিনি (আঃ) বলেন, "তাঁর অনুভূতি এই যে (মেহমানগণ) নম্রতার সাথে ব্যবহার করেন।" অর্থাৎ বাইরের জ্ঞান হতে আগত অধিকাংশ মেহমানই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। "খোদা করুন আমাদের জামাতের উপর সেই দিন উদিত হোক যেদিন অজানা লোকদের আগমনে আমরা তাদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করি।" অনেক সময়ে জলসার দিনগুলিতে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। সেই দিনগুলিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কি আশা করেন (তা শুনুন)। "তিনি (আঃ) বলেন, আজকাল আবহাওয়াও খারাপ এবং যতজন এখানে এসেছেন তারা সবাই মেহমান। তাই মেহমানদের সম্মান দেয়া উচিত।" ইহাতে আহমদী গয়ের আহমদী বা মুসলমান বা অমুসলমানের কোন পার্থক্য করা হয়নি। "এ জন্যে খাবার ব্যবস্থা উত্তম হওয়া উচিত। কেউ দুধ চাইলে তাকে দুধ দাও, কেউ চা চাইলে তাকে চা দাও। কেউ অসুস্থ হলে তাকে পথ্যানুযায়ী খাদ্য দাও।" এখানে জামাতের পক্ষ হতে দুধের কোন ব্যবস্থা হয়ে থাকে কি না এ সম্বন্ধে আমি জানি না। তবে বিরামহীনভাবে চায়ের লঙ্গর চলতে থাকে। ইহা ছাড়া অসুস্থদের জন্য খাবার বা এমন খাবার যা অসুস্থ ব্যক্তিও খেতে পারে ব্যবস্থা থাকে।

একদা তিনি (আঃ) লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপক মীর রবীউদ্দীনকে ডেকে বলেন "শুনো! অনেক মেহমানের সমাগম ঘটেছে। তাদের মধ্য হতে কতককে তুমি চিনো আর কতককে চেনো না। তাই সবাইকে সম্মানিত মনে করে আপ্যায়ন কর।" কাউকে চিনো বা না চিনো তাদের মধ্য হতে কেউ কোন জাতির সম্মানিত ব্যক্তিও হতে পারে। প্রত্যেকের সাথে এরূপ ব্যবহার কর যেন সবাই সম্মানিত। "শীতকাল তাই সবাইকে চা পান করাও। কেউ যেন কষ্ট না পায়।" এখানে ইউ, কে জামাতের জন্য সুবিধা রয়েছে যে, এখানে দুধের উল্লেখ নেই। "শীতকাল তাই সবাইকে চা পান করাও, কেউ যেন কষ্ট না পায়। তোমাদের প্রতি আমার সুধারণা যে, তোমরা মেহমানকে সুখ দিয়ে থাকো। যদি কোন কক্ষে বা ঘরে শীত (বেশি লাগে) তবে সেখানে কয়লার ব্যবস্থা করে দাও।" কিছু এলাকার লোকদের শীত না পড়লেও বেশি শীত লাগে। পাকিস্তানের তীব্র তাপদাহের এলাকা হতে আগত কিছু (মেহমান) আমাকে বলেছে যে, এখানে তো শীত। যদিও এখন শীত নেই। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনে এমনটি হয়ে থাকে। ইন্দোনেশীয়ার মেহমান শীত বা গরমে যখনই এখানে আসে শীতে কম্পমান থাকে। এ জন্যে তাদের ব্যারাকে হিটারের ব্যবস্থা করার কথা বলেছি। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে তারা তোমাদের কাছ থেকে ইহার দাবী রাখে। মৌলবী হাসান আলী সাহেব তার ঘটনা নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন, যা তার পুস্তক "তাঈদে হক (সত্যের সমর্থন)" এ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেন যে "মির্যা সাহেবের অতিথিপরায়ণতা দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হলাম।" ইহা হাসান আলী সাহেবের আহমদীয়ত গ্রহণ করার পূর্বের সফরের বর্ণনা। ইহা তিনি আহমদীয়ত গ্রহণ করার পর ঠিক ঐভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা তিনি দেখেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন। "মির্যা সাহেবের অতিথি-পরায়ণতা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। একটি ছোট ঘটনা লিখছি, যা পড়ে পাঠক তাঁর (আঃ) অতিথিপরায়ণতা সম্বন্ধে অনুমান করতে পারবেন। আমার পান খাওয়ার বদ অভ্যাস ছিল।" মনে হয় যখন তিনি এই ঘটনা লিখেছেন তখন তিনি পান ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেন, "আমার পান খাওয়ার বদ অভ্যাস ছিল। অমৃতসরে আমি পান পেলাম কিন্তু বাটালাতে কোথাও পান পেলাম না। উপায় না দেখে এলাচী খেয়ে ধৈর্য ধারণ করলাম। অমৃতসরের আমার বন্ধুটি অদ্ভুত কাজ করলো। সে অজান্তে কোন এক সময়ে মির্যা সাহেবের কাছে আমার এ বদঅভ্যাসের কথা বলে ফেল্লো। জনাব মির্যা সাহেব এক ব্যক্তিকে গুরুদাসপুর পাঠালেন। দ্বিতীয়দিন এগারোটার সময় খাবার

খাওয়ার পর পান সামনে পেলাম। ষোল ক্রোশ (এক ক্রোশ– দুই মাইলের কিছু বেশি পথ) দূর হতে আমার জন্যে পান আনানো হয়েছে।" ইহা ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অতিথিপরায়ণতা যার মধ্যে লোক দেখানোর মিশ্রণ বিন্দু মাত্রও ছিল না। মেহমান মনে করছিল এখানে পান পাওয়া যাবে না। যখন বাটালাতে পান পাওয়া যায়নি তখন কাদীয়ানে কীভাবে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ষোল ক্রোশ (৩২ মাইল) দূরে লোক পাঠিয়ে পান আনিয়ে মেহমানকে তার অভ্যাসানুযায়ী পান পেশ করলেন।

এখন আমি জলসায় আগমকারী ও অতিথি সেবকদের কিছু নসিহত করব যা আমি সর্বদাই জলসার পূর্বের জুমুআতে করে থাকে। কর্য নেওয়া– কর্য নেওয়ার অভ্যাস কিছু লোকের মধ্যে থাকে। আর এই অভ্যাস যাদের থাকে তাদের উহা ফেরৎ দেবারও অভ্যাস থাকে না। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন এমন লোক এসে থাকেন তবে তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌র অতিথি সেবাকারীদের মেহমানদের উপর এই কর্তব্য রয়েছে যে, তাদের অযথা যেন কোন কষ্ট না দেয়া হয়। **এখানে যারা আপনাদের অতিথি সেবা করবে তাদের কাছ হতে কর্য চাইবেন না এবং তাদের ছাড়া নিজেদের মধ্যেও কর্য নিবেন না। কেননা, আমি জানি যাদের মধ্যে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের ফেরৎ না দেবার অভ্যাসও রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে। আমি এর পূর্বে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম যে, যাদের সত্যিই কোন প্রয়োজন হবে তারা যেন জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ করে। আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা আমাকে লিখুন যে কী প্রয়োজন পড়েছে।** আল্লাহ্‌তালার ফযলে সঠিক প্রয়োজনকে সর্বদাই মিটানো হয়েছে। তবুও কেন নিজেকে ও অপরকে পরীক্ষায় ফেলেন। লেন-দেনের ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যান। যারা আত্মীয়-স্বজন তাদের বেলায় তিন দিন বা পনর দিনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আত্মীয় আত্মীয়ের নিকট যায় আর এই ব্যবস্থা ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। কিছু এমন আত্মীয় রয়েছে যারা নিজেদের আত্মীয়কে কয়েকমাস রাখতে চায় এবং তাদের চলে যাওয়াতে তারা কষ্ট পায়। ইহা এমন এক বিষয় যাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা যায় না। ইহা পরস্পরের এমন এক সম্পর্ক যা নিজে নিজেই ক্রিয়া করতে থাকে। তাই এমন আত্মীয়গণ নিজেদের তিন দিন বা পনর দিনের মধ্যে গণনা করবেন না। এখানে অনেক আত্মীয়-স্বজন নিজেদের বাড়ীতে তাদের স্বজনদের নিয়ে যান এবং থাকার জন্য অনুরোধও করেন। তবে ইহার মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে। যদিও তারা আত্মীয় তথাপি তিন দিন বা চৌদ্দ দিনের অধিক থাকাটা আত্মীয়ের অধিকার নয়। এ জন্যে ইহা যদি দুই পক্ষের সম্মতিতে হয় তবে ইহা ন্যায়-সঙ্গত। কেউ যদি নিজের আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠে এবং আমার এ খুতবার উদ্ধৃতি দিয়ে যতদিন ইচ্ছা থাকতে থাকে তবে উহা ভুল ও মিথ্যা হবে। ইহাতো পরস্পরের সমঝোতা যাকে ইংরেজীতে RECIPROCAL (পরস্পর বিনিময়) বলে। অর্থাৎ দুই দিক হতে একই ধরনের বিষয় হলে উহা ন্যায়-সঙ্গত।

"আফশুস সালাম" (সালামকে ছড়াও)-এর নির্দেশ রয়েছে। আ হযরত (সঃ) বলেছেন যে, সালামকে ছড়াও। এ অভ্যাস আপনারা গড়ে তুলুন। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ঐ সুন্নত যা আমি বর্ণনা করেছি উহাও সালাম দ্বারা শুরু হয়। সালাম বলতে দু'টি বিষয় সামনে থাকবে। **প্রথমতঃ এভাবে আপনারা সকল আগমনকারীদের সম্মান করবেন। দ্বিতীয়তঃ সালাম বলে আপনি তাকে নিশ্চয়তা দিবেন যে, আপনার তরফ হতে তার জন্যে কোন শঙ্কা নেই। আপনার তরফ হতে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। এ দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে আপনারা সালাম ছড়ানোর অভ্যাস গড়ুন।**

মহিলাদের আমি সর্বদা নসিহত করে থাকি যে, পর্দার প্রতি খেয়াল রাখবেন। কিন্তু মেহমান মহিলাদের নিয়ে অসুবিধা রয়েছে। এ জন্যে এমন মেহমান মহিলা, যে খুব সাজ-সজ্জা করেছে ও পর্দাও করছে না মনে করতে হবে যে, সে সম্ভবতঃ আহমদী নয়। কিন্তু আরব হতে আগত মেহমানগণ জলসায় আগমনকারী প্রতিটি মহিলার কাছ থেকে আমাদের প্রচলিত পর্দার আশা করেন। তাদের মধ্য থেকে কিছু ফিরে গিয়ে আমার কাছে অভিযোগের চিঠিও লিখেন যে, আমরা তো আশা করে গিয়েছিলাম আপনারা পর্দার উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাবেন। কিন্তু সেখানে এমন কিছু মহিলা দেখেছি যারা পূর্ণ সাজ-সজ্জায়, চুল কাটা ও ওড়না বিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথমতঃ আপত্তি করতে তড়িঘড়ি করবেন না। মু'মিন অপর মু'মিন সম্বন্ধে সুধারণা রাখে। এ জন্যে কেন সুধারণা করেন না? ব্যবস্থাপকের জন্যেও এমন মহিলাদের সোজাসুজি বা স্পষ্টভাবে ইহা বলা সমীচীন নয় যে, তোমরা পর্দা করে চলাফেরা কর। অনেক সময় যাদের এভাবে চলাফেরা করে অভ্যাস তারা এতে অসন্তুষ্ট হন। অনেক সময় এমন মহিলারা, যারা নতুন আহমদী হয়েছেন তারা আহমদীয়তের সঠিক রীতি-নীতি না জানার কারণেও এমনটি করে থাকেন। কিছু এমন মহিলা রয়েছেন যারা অসুস্থতার কারণে মাথাকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকতে পারেন না। যা-ই হোক আহমদী মহিলারা যদি কোন অসুবিধার কারণে পর্দা করতে না পারেন তবে তারা যেন মাথা অবশ্যই ঢেকে রাখেন। এখানকার উর্দু ক্লাস ও choosen class (নির্বাচিত ক্লাস)-এর মেয়েদের আমরা নসিহত করেছি। তাদের পরিবর্তন দেখে আপনারা আশ্চর্যান্বিত হবেন। এখানে গড়ে উঠা ছোট ছোট মেয়েরা যেভাবে মাথা ঢেকে চলে তা দেখে মন প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠে। এই পবিত্র দৃষ্টান্তকে আপনারাও গ্রহণ করুন। পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশ হতে আগত মেয়েদের মাঝে আমি অনেক সময়ে অন্যায়মূলক স্বাধীনতার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। তারা জানে না যে, ইংল্যান্ডের মেয়েরা (পর্দার দিক হতে) অনেক উন্নতি করেছে। যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা লাহোর, করাচী ও পিন্ডির পরিবেশ নিয়ে আসেন যেখানে বর্তমানে বেপর্দা হওয়া সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ জন্যে আপনারা ইহা মনে করবেন না যে, আপনারা আপনাদের অভ্যাস এখানকার (মেয়েদের শিখাতে এসেছেন)। এদের কাছ থেকে আপনাদের চলাফেরা শিখতে হবে। আপনারা যদি মেহমান হয়ে জলসায় এসে থাকেন তবে আপনাদের মাতা-পিতার দায়িত্ব যে, আপনাদেরকে শালীনতার সাথে চলতে ফিরতে শেখান। আপনার বয়স যদি পর্দার না হয়ে থাকে বরং এমন বয়স যখন পর্দা করা বা না করার একটু সুযোগ থাকে তবে আপনাদের বিশেষভাবে মাথা ও বুক ঢেকে চলাফেরা করতে হবে। আর মাথা ঢাকার সময় চুলের প্রদর্শন যেন না হয়। কতক মেয়ে মাথায় ওড়না পরে আর পিছন দিক হতে কাটা চুল দুলাতে দুলাতে চলাফেরা করে। কতক মহিলাও এমনটি করেন। মুলাকাতের সময় এমন মহিলাদের সাথে আমার সামনা-সামনি হয় আমি কষ্ট পাই কিন্তু মেহমানের সম্মানের খাতিরে তাদেরকে সরাসরিভাবে কিছু বলি না। তবে পরবর্তীতে তাদের পিতা-মাতাদের বুঝিয়ে দিই। এ (জলসার) সময়ে প্রত্যেক ধরনের মহিলার সমাগম ঘটবে। তাই লাজনা সংগঠনের ঐ সদস্যবৃন্দ যারা ভালোভাবে বুঝিয়ে কথা বলতে পারে তাদের ডিউটি হবে যে, তারা যেন এমন মহিলাকে পৃথকভাবে, নম্রভাবে, বুঝানোর চেষ্টা করেন। "ফাযাক্কের ফাইন্না ফাআতিয যিক্‌রা" নসিহত অবশ্যই লাভজনক হয়। আমি আশা করি জলসায় আগমনকারীণিদের এদিক হতেও লাভ হবে। যাই হোক যাদের ডাক্তারী দিক হতে মাথায় কাপড় নিতে কষ্ট রয়েছে তাদের লিপষ্টিক, পাউডার লাগিয়ে সেজেগুজে বের হবার অধিকার নেই।

রাস্তার প্রাপ্য, আঁ হযরত (সঃ) ইহাকেও ঈমানের অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন যে, রাস্তার প্রাপ্য আদায় কর। রাস্তার প্রাপ্য সম্বন্ধে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আজকের এই জুমুআতে বর্ণনা করছি। যদিও পূর্বেও ইহা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এই যে, বাজার বা দোকান সমূহে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যা কিনবেন প্রশস্ত স্থানে গিয়ে তা খাবেন। কতিপয় লোক কাবাবের দোকানে কাবাব নামার অপেক্ষায় লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কোন স্থান খালি রাখেন না। নিজের পসন্দমত জিনিস কিনে সড়ে দাঁড়ান। গরম কাবাব খাবার ইচ্ছা থাকলে ঘরে বানিয়ে খান। বাজারের প্রাপ্য যেভাবে হোক আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ভীড় করে বাজারে দাঁড়িয়ে থাকাই যে দৃষ্টিকটু তা নয় বরং দল করে হাসি-ঠাট্টা করে চলাফেরা করাও অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনেক সময়ে ইহা গুনাহ্‌তে পরিণত হয়। ইহাও রাস্তার প্রাপ্য আদায়ের পরিপন্থী। রাস্তার অর্থ শুধু রাস্তাই নয় বরং সরকারী খাস জায়গা বুঝায়। সাধারণ লোকদের চলাফেরার স্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখেছি এমন লোক যারা দল করে হাসি-ঠাট্টা করে বেড়ায় তাদের এই অনুভূতি থাকে না যে, অন্যান্যরা তাদেরকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখছেন। বরং অনেক সময়ে চলাচলকারী মনে করে তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অনেক সময় ঠিক সেই সময়, হাসি দিয়ে উঠে যখন কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করে। এভাবে ঐ চলাচলকারী ভীষণ কষ্ট পায়। অনেক সময় এর কারণে ঝগড়াও হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন। **দলবদ্ধ হয়ে চলতে হলে চুপচাপ চলুন। ধীরে কথা বলুন উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। কাউকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেবার কারণ হবেন না। কষ্টদায়ক বস্তুকে রাস্তা হতে অপসারণ করাও ঈমানের এক অঙ্গ। রাস্তায় পেরেক, কাঁটা বা কলার খোসা দেখলে এ কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার) কর্মরতদের অপেক্ষা না করে নিজেই ইহা অপসারণ করুন। এমন বস্তুকে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করার প্রয়োজন এবং এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া থেকে নিজেকেও বিরত রাখুন।** যেখানে কষ্টদায়ক বস্তুর অপসারণের নির্দেশ রয়েছে সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা মন্দ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অপসারণ করা ভাল কাজ, কিন্তু ইহা সৃষ্টি করা গুনাহ্‌। কেননা, কষ্টদায়ক বিষয় অপসারণ করা ফরয। **এ জন্যে আমার পরামর্শ নিজেদের পকেটে একটি পলিথিনের ব্যাগ রেখে নিন। এতে পকেট ফুলে থাকবে না। কোথাও যদি কোন কিছু খান উদাহরণস্বরূপ কলা খেলেন উহার ছিল্‌কা বা অন্য কিছুর অবশিষ্টাংশ ঐ পলিথিনের ব্যাগে রেখে নিন। অনুরূপভাবে রাস্তায় কোন বিপজ্জনক বস্তু পেলেন উহাও ঐ ব্যাগে উঠিয়ে নিতে পারছেন। এই ব্যাগ আবার পকেটে রাখা আবশ্যকীয় নয়। হাতে ঝুলিয়ে রাখুন ডাস্টবিন দেখলে উহাতে ফেলে দিন।**

পরিশেষে নিরাপত্তা বিষয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখবো। জামাতে আহমদীয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয়। ইহাতে মোটেও অতিশয়োক্তি নেই। পৃথিবীর কোথাও কোন লোক সমাগমের স্থানে বা বড় রাষ্ট্র প্রধানের জন্যও এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা-ব্যবস্থা হয়ে থাকে না যেমনটি জামাতে আহমদীয়াতে প্রচলিত হয়ে গেছে। ইহার কয়েকটি দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমতঃ প্রতিটি আহমদী নিজের স্থানে পর্যবেক্ষক বিশেষতঃ ঐ আহমদীগণ যারা নিষ্ঠার সাথে খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। তাদের চিঠিতে ও এখানে আসার পরও এ চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে যে, নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে কি-না। **তাদেরকে ও আপনাদের আমার নসীহত হলো নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় তো আপনারা রয়েছেন। চোখ কান খোলা রাখেন এবং যে ব্যক্তি সম্বন্ধে আশংকার সন্দেহ রয়েছে তার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে গেঁথে নিন। অনেক সময় নিষ্ঠাবান আহমদীর চেহারা ও পোশাকের দরুন ভয়ের সৃষ্টি হয়। কিছু লোকের চেহারা-সুরতই এমন হয়।** এক জলসায় এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তি যে নিষ্ঠাবান আহমদী ছিল। তার ক্লীন সেভ ও চেহারা-সুরতে সন্দেহভাজন মনে হলো। তার এমনভাবে নিগরানী হচ্ছিল যেন সকল আশংকা তার কাছ হতেই আছে। যখন আমাকে বলা হলো আমি তাকে দেখলাম। আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহ্‌ আমিতো একে চিনি। এতো নিষ্ঠাবান আহমদী। এর দ্বারা নিরাপত্তার কাজ নিন। সুতরাং আগমনকারী এবং এখানকার বসবাসকারীদের অর্থাৎ যারা জলসায় থাকবেন তাদের আমার নসিহত হলো **নিজের ডান বামের হিফাযত করুন। পৃথিবীতে কোথাও এই ব্যবস্থাপনা নেই। যখন কোন ব্যক্তি আক্রম করতে চায় তখন সে অস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ নির্ণয়কারী যন্ত্রকে (ফাঁকি) দিয়ে তা নিয়ে যায়।** অজস্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন ব্যক্তি যে অস্ত্র ব্যবহার করতে চায় সে দ্রুত নড়াচড়া করে নিজ হাতকে পকেটে বা অস্ত্রের স্থানে নিয়ে যেতে চায়। **ডান বামের লোক সতর্ক থাকলে এমন ব্যক্তির জন্য এমনটি করা কখনও সম্ভব হবে না।** যাই হোক আসল নিরাপত্তাকারী তো আল্লাহ্‌। এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন উহার উপর আমল করা জরুরী। অতএব নিজের ডান বামের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। অনেক সময় যাদের আপনারা ভাল মনে করেন তাদের মধ্যেও মন্দ লোক লুকিয়ে থাকে। এজন্য পর্যবেক্ষণ বা সজাগ দৃষ্টি সবার প্রতিই রাখতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ ডান-বামের পর্যবেক্ষক হয়। উঠতে-বসতে ও চলাফেরার সময় এমনভাবে চললে পরে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ইহা নিরাপত্তার এমন এক ব্যবস্থা হবে যা পৃথিবীতে কোন প্রধানের জন্য কখনও কোথাও হয় নি ও হবেও না। দুই সারিতে দাঁড়ানোর সময়ও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আমরা রাবওয়াতে ইহা পরীক্ষা করেছি ও সফলও হয়েছি। দুইবার আমার উপর অনিবার্যভাবে বন্দুক দ্বারা ফায়ার করার উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থাপনার ফলে বানচাল হয়েছে। এরা চাদরের বা কম্বলের নীচে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। তখন আমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম এমন সন্দেহভাজনদের চাদর খুলতে না বলে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখো। তারা নড়াচড়া করলে পরে তাদের ধরে ফেল। আর এমনটিই হয়েছিল। দুই ব্যক্তি ধরা পড়েছিল। তারা স্বীকারোক্তিও দিয়েছিলো। ইহা নিরাপত্তার এমন এক ব্যবস্থাপনা যা পৃথিবীতে না কোথাও আছে, আর না ইহার কোন উপমা খুঁজে পাওয়া যাবে। পুলিশ বা আর্মি কয়জন হবে। এদের পিছনে তো লোকদের ভীড় থাকে। সেখানে যে কেউ তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য স্বাধীন থাকে। খুতবার সময় শেষ হয়ে এসেছে তাই নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের বলছি যে, **নিরাপত্তার প্রথম সত্তা হলেন খোদাতাআলা। তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় থাকলে পৃথিবীর কোন কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না। এ জন্যে দোয়া করতে থাকুন। জামাতের সম্বন্ধে যে উঁচু ধারণা পোষণ করা হয় উহার খেয়াল রাখুন।** আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের জলসাকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে উত্তমভাবে সম্পাদন করে দিন। প্রতিটি আঙ্গিকে যেন জলসা সুখকর হয় এবং আপনারা যেন সুসংবাদ নিয়ে ফিরে যান। নিজ দেশের জন্য দোয়া করে ফিরে যান যেন সেখানে সুখকর পরিবর্তন ঘটে।

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ – মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী

(দশম কিস্তি)

দ্বাদশ প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব বলুন, যদি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এই অর্থে 'আখেরুল আম্বিয়া' ছিলেন যে, তিনি (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) চূড়ান্তভাবে শেষ নবী ছিলেন, তবে তিনি কেন মসীহ্ মাওউদকে 'নাবীউল্লাহ্' ('আল্লাহ্‌র নবী') বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং উপরোক্ত তিন হাদীসেই তাঁহার পর নবী আসার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন ?

নোট :

মওদুদী সাহেবের উদ্ধৃত নবুওয়ত কর্তিত হওয়া সম্বন্ধে হাদীসগুলির মূল-সূত্রগত উত্তর আমরা উম্মতের সর্বজনমান্য দীনের ইমাম, আওলিয়া এবং ফকীহ্‌গণের সিদ্ধান্তগুলি হইতে দিয়াছি। বিস্তৃত জবাব (মাসিক) 'আল্ ফুরকান' ১৯৬২ সনের এপ্রিল-মে মাসে প্রকাশিত 'খাতামুন্নবীয়ীন সংখ্যা', কিংবা 'নশর ও ইশাআত' বিভাগ হইতে প্রকাশিত "আল কাউলুল্ মুবীন ফি তফসীরে খাতামুন্নবীয়ীন' কেতাবে দ্রষ্টব্য। মুফাস্‌সেরগণের উক্তি সম্বন্ধেও তাহাতে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে।

মুসায়লামা কায্‌যাবের সহিত যুদ্ধের কারণ

মওদুদী সাহেব "ছাহাবাদের ইজ্‌মা" শীর্ষ দিয়া তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেনঃ

"ছাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না। বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অছল্লামের পর নবুওয়াতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার উপর ঈমান আনে। রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং ছাহাবাদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হয়। ছাহাবাদের ইজমার চাইতে সুস্পষ্ট মিসাল আর কি হতে পারে?" [খতমে নবুওয়াত, বাঙলা সংস্করণ, ২৩ পৃঃ]

মওদুদী সাহেবের এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ সাহাবা যে অপরাধের কারণে মুসায়লামা কায্‌যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিদ্রোহের অপরাধ ছিল–নবুওয়তের দাবী করিবার অপরাধ নহে। মুসায়লামা কায্‌যাব নবুওয়তের দাবী আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়েই করিয়াছিল। তিনি এই কারণে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করেন নাই। সুতরাং হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হু ও সাহাবাকেরাম রাযি আল্লাহু আন্‌হুম এই কারণে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান কীরূপে করিতে পারিতেন? মওদুদী সাহেবের এই বিবৃতি ইসলামী ইতিহাসের সম্পূর্ণ খেলাফ। তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। নচেৎ প্রকৃত ঘটনা এই যে, মুসায়লামা বিদ্রোহী ছিল এবং তাহার সাথীরা যোদ্ধার্থী ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) ছিল। অর্থাৎ ইস্‌লামী রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করার ফলে, যুদ্ধ-লিপ্ত কাফেরদের প্রতি ব্যবহার করিবার ন্যায় তাহাদের প্রতি ব্যবহার করা হয় – মুসলমান বিদ্রোহীর প্রতি ব্যবহারের ন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই। হায়দরাবাদ, (দাক্ষিণাত্য) হইতে প্রকশিত উর্দু সংস্করণ 'তাবারীর ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইলঃ

(১) মুসায়লামা বিদ্রোহ করিয়াছিল *[৯৩ পৃঃ]*।

(২) চল্লিশ সহস্র সুসজ্জিত যুদ্ধার্থী প্রস্তুত করিয়াছিল *[৭১পৃঃ]*।

(৩) মুসায়লামা বলিয়াছিল যে, সে সাজ্জাহের বাহিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া সমগ্র আরব অধিকার করিবে *[৭১ পৃঃ]*।

(৪) ইস্‌লামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত ইয়ামামাতে নিজেই খাজানা গ্রহণ করিত *[৭১ পৃঃ]*।

(৫) এতদ্ব্যতীত, 'তারীখুল খামীসে' লিখিত আছে যে, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মুসায়লামা হিজর ও ইয়ামামা এলাকা হইতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিযুক্ত শাসনকর্তা সামামা-বিন্ আসালকে বহিষ্কৃত করে এবং স্বয়ং স্বাধীন শাসনকর্তা হইয়া পড়ে। *[২য় খণ্ড, ১১৭ পৃঃ]*

সুতরাং, সাহাবাগণ মুসায়লামা কায্‌যাব এবং তাহার গোত্র 'বনুহুনায়ফার' বিরুদ্ধে শুধু ধর্ম-ত্যাগের কারণে যুদ্ধ করেন নাই, বরং বিদ্রোহের যুদ্ধ দরুণ করা হয়। কারণ মুসায়লামা বিদ্রোহী ছিল এবং 'বনু-হুনায়ফা শুধু মুরতাদই ছিল না– যুদ্ধার্থী মুরতাদ ছিল।

হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হু তখন যে সকল আরব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন গোত্রগুলিও ছিল, যাহাদের মধ্যে নবুয়তের দাবী কারক কেহই ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হুর ঘোষণা অনুসারে তাহাদের প্রতি যুদ্ধে একই প্রকার ব্যবহার করা হইয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দাস করা হইয়া ছিল। মুসায়লামা কায্‌যার সম্বন্ধে হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হু এমন কোনই বিশেষ ঘোষণা করেন নাই যে, সে নবুয়তের দাবী করায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা হইতেছে।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি, মওদুদী সাহেব সত্যবাদী হইয়া থাকিলে তিনি এরূপ 'বিশেষ ঘোষণা' উপস্থিত করুন, যদ্বারা সাহাবাগণের এই ইজমা' বা মৌন ইজমাই প্রমাণিত হয় যে, মুসায়লামা কায্‌যাব নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন।

মুসায়লামা তশ্‌রীয়ী নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল

প্রকাশ থাকে যে, মুসায়লামা কায্‌যাব তশ্‌রীয়ী (শরীয়তবাহী) নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে নবুওয়তের দাবী করিত। সুতরাং, যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, এই প্রকার ঘোষণা হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আনহুর দিক হইতে করা হইয়াছিল বলিয়া পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বড় জোর এই প্রমাণ করা যাইত যে, সাহাবা 'তশ্‌রীয়ী, শরীয়ত-বাহী নবুওয়তের' দাবীকে খতমে নবুওয়তের বিরোধী জ্ঞান করিতেন বলিয়া তশ্‌রীয়ী নবুওয়তের দাবীও যুদ্ধাভিযানের একটি কারণ ছিল এবং দ্বিতীয় কারণ তাহার বিদ্রোহ ছিল।

ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসায়লামা 'তশরিয়ী' (বা শরীয়তবাহী) নবুয়তের দাবীদার ছিল। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ

সাহেব লিখিয়াছেনঃ
"সে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ তশরীয়ী নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল এবং শরাব ও যেনাকে হালাল নির্দেশ করিয়াছিল। নামায ফরয হওয়াকে রহিত করিয়াছিল। কুরআন মজীদের প্রতিযোগিতাপূর্বক সূরা লিখিয়াছিল। সুতরাং, দুষ্ট ও বিপ্লবী লোকের দল তাহার অনুবর্তী হইয়া পড়ে" *['হুজাজুল কেরামাহ্' 'ফারসী' ২৩৪ পৃঃ হইতে অনূদিত]*।
এই কথাই 'তাবারীর ইতিহাসে' (প্রথম জেল্‌দ, ৫৮১ পৃঃ) লিখিত আছে। বস্তুতঃ মুসায়লামা তশরীয়ী নবুওয়তের দাবী করায় কাফের ছিল এবং ইস্‌লামী হুকুমতের বিদ্রোহাচরণ করায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধ-লিপ্ত কাফেরদের ন্যায় তাহার প্রতি ব্যবহার করা হইয়াছিল।

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর সতর্কতা

তাবারীর ইতিহাসে, (উর্দু সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ৬৭ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে যে, হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আনহু সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দেনঃ-
"এই মুরতাদ্‌দের উপর হামলা করিবার পূর্বে তাহাদের গ্রামের বাহিরে 'আযান' দিবে। যদি তাহারাও 'আযান' ও 'ইকামত' বলে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে আর অগ্রসর হইবে না।"
এই পরম সতর্কতা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এই জন্যই অবলম্বন করেন যে, মুসায়লামা কায্‌যাব এবং তাহার সাথীদের মধ্যে ইস্‌লামী 'আযান ও 'ইকামত' পাওয়া গেলে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে তিনি নিষেধ করেন। কোথায় হযরত আবূ বকর রাযি আল্লাহু আনহুর এই সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতা এবং কোথায় মওদুদী সাহেবের এই অত্যাচারমূলক 'হরকত' যে, আহ্‌মদীগণ আযান দেওয়া, কেবলামুখী হইয়া ইসলামী নামায পড়া, ইস্‌লামের পাঁচ মূল বিষয়ের উপর ঈমান রাখা এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম 'খাতামুন্নবীয়ীন' একীন করা সত্ত্বেও 'তশরীয়ী নবুওয়ত' দাবীকারী মুসায়লামা কায্‌যাবের ন্যায় তাহাদিগকে ধর্ম-ত্যাগী 'মুরতাদ' সাব্যস্তপূর্বক 'ওয়াজেবুলকতল' বা বধ্য বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন হইল আমাদের এই বিবৃতি পাঠ করিয়াও কি মওদুদী সাহেব একথা বলিতে পারেন যে, মুসায়লামা কায্‌যাব 'তশরীয়ী' (শরীয়ত-বাহী) নবুওয়তের দাবীকারক ছিল না, 'উম্মতি নবী' হওয়ার দাবীদার ছিল–ইস্‌লামী রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল না এবং ইস্‌লামী রাষ্ট্রাধীনে একজন শান্তিপূর্ণ নাগরিকরূপে জীবনযাত্রা করিত?

মুফাস্‌সেরগণের উক্তি

"আলেম সমাজের ইজমা" শীর্ষাধীনে মওদুদী সাহেব 'খাতামুন্নবীয়ীন' সম্বন্ধে মুফাস্‌সেরগণের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া এই অপচেষ্টা করিয়াছেন যে, সমগ্র উম্মতের 'ইজমা' (বা সর্ব্বাদীসম্মত মত) এই যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহার এই ইজ্‌মার দাবী বৃথা। কারণ তের জন সর্বজনমান্য বুযর্গের উদ্ধৃতি দিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, 'খাতামুন্নবীয়ীন' সম্বলিত আয়াত এবং আহাদীসে নববী দ্বারা শুধু তশ্‌রীয়ী নবুওয়তের অবসান বুঝায়। উম্মতের ইজ্‌মার দাবী করা হইলে শুধু এইটুকু করা যায় যে, পূর্ববর্তী উলামাগণের ইজ্‌মা শুধু শরীয়ত-বাহী ও স্বাধীন নবুওয়ত কর্তিত হওয়া সম্বন্ধে পাওয়া যায় এবং এই ইজ্‌মাতে আহ্‌মদীয়া জামাতও শামিল।
মুফাস্‌সেরগণের যে সকল উক্তি মওদুদী সাহেব পেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মওদুদী সাহেবের সহিত এই বিষয়ে একমত নহেন যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম নবুওয়তচ্যুত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন। দৃষ্টান্তস্থলে, ইমাম আলী কারী রহমতুল্লাহে আলায়হে পরিষ্কার বলিয়াছেনঃ
"ঈসা আলায়হেস্ সালামের নবী হওয়া এবং তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের অধীন হইয়া শরীয়তের আহ্‌কাম বর্ণনা করা এবং তাঁহার তরীকাকে পাকা করার মধ্যে কোনই বিরোধ নাই, যদিও তিনি এই কাজ তাহার উপর অবতীর্ণ অহী দ্বারা করিবেন *['মিরকাত শরহে মিশকাত']*।
আল্লামা আলুসী মিসরী, কুরআন করীমের মুফাস্‌সের। তিনি তাঁহার তফসীর 'রুহুল্ মাআনীতে' লিখিয়াছেনঃ
"ফাহুয়া আলায়হেস্ সালামু নাবিয়ুন্ ও রসূলুন্ কাব্‌লার্ রাফ্‌-এ ওয়া ফিস্ সামায়ে ও বাদান্ নযুলে আইযান"
অর্থাৎ "হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম উত্তোলিত হওয়ার পূর্বেও নবী ও রসূল ছিলেন, আকাশেও তিনি নবী ও রসূলই আছেন এবং নাযিল হওয়ার পরেও তেমনি (নবী ও রসূল) থাকিবেন" [৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১ পৃঃ] (চলবে)।

অনুবাদ– এ, এইচ, এস আলী আনোয়ার (মরহুম)

WEDDING

My nephew Mr. ABDUL ALEEM KHAN CHOWDHURY (Son of late Dr. ABDUS SAMAD KHAN CHOWDHURY of Dhanmondi, Dhaka) married Miss SHAHINA SOHELI (SATHI) daughter of Mr. SHAHIDUL ALAM of Khulna on 25 December 1997. The NIKAH was performed by Maulana ABDUL AZIZ SADEQ, Sadar Murabbi, Mohrana was fixed at Tk. 100,000 (one lac). Walima was held on 28 December, 1997. Prayers of all members of Jamaat are solicited.

24/8/1998 **Nuruddin Amjad**

শুভবিবাহ

আমার প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ আরজুমান আরা খানম-এর শুভ বিবাহ গত ১৪ই আগষ্ট, ৯৮ রোজ শুক্রবার, আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুষ্টিয়া নিবাসী মরহুম গোলাম মহিউদ্দিনের পুত্র জনাব গোলাম আহমদ (শাহীন) এর সাথে ৪০,০০১/= (চল্লিশ হাজার এক টাকা) দেনমোহর ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাসিরাবাদ এর মোয়াল্লেম জনাব মোহাম্মদ আব্দুস্ সালাম।
এই নব দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন সুখী ও সুন্দর হয় সেজন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি – মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান, প্রেসিডেন্ট নূরনগর জামাত, ঈশ্বরদী।

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(তৃতীয় অধ্যায়)

অবদানের অফুরন্ত ভান্ডার

কিছু জরুরী কথা ঃ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও আমাদের মাঝে বিভিন্ন কারণে যেসব ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে চলেছে ওসব অতিক্রমের পন্থাদি নিয়ে আলোচনাকে সহজবোধ্য করা ও সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য কিছু জরুরী কথা বলতে হচ্ছে। হুযূর (সঃ)-এর শিক্ষা, নীতি ও আদর্শ বর্তমান যুগের উপযোগী কিনা তা বিচার করতে হলে যেসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সামনে রাখতে হবে তা হলো ঃ (১) মানুষের জীবন ও তার সমাজ ব্যবস্থার ধারা অন্যান্য প্রাণী ন্যায় স্থবির নয়। দৈহিক পরিমাপ দ্বারা তার জীবনের পরিধি বিচার করা যায় না। তার জীবনে নিত্য-নতুন ধ্যান-ধারণার সংযোগ ঘটছে। গবেষণা দ্বারা অহরহ সে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করে চলেছে। এতেই সে ক্ষান্ত হচ্ছে না। প্রযুক্তির উন্নয়ন দ্বারা ওসবকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে কাজে লাগাচ্ছে। তাতে তার চলনে-বলনে, আচার-আচরণে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে চলেছে। সবই যে কল্যাণের হচ্ছে তা হয়। যাই হোক না কেন স্থবিরতা এখানে আসন পাচ্ছে না। যদি কোন বিশেষ কারণে তার জীবন ও সমাজে নির্জীবতা দেখা দেয়, তা চিরস্থায়ী হয় না ; এমন কি নতুন নেতৃত্বের পরশে এরূপ জীর্ণ অবস্থা হতেই মানুষ শুধু মুক্তিই পায় না, নতুন সভ্যতারও অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ায়, (২) মৌল সত্য সময়, ভৌগলিক ও ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করে যায়, যা মানুষের সৃজনী শক্তির আলোচনায় বলা হয়েছে। আজকাল পত্রিকাদিতে 'বাণী চিরন্তনী', অমৃত বাণী' 'অমর গাঁথা' এসব নামে যে সকল উদ্ধৃতি দেয়া হয়, ওসবও আমাদের উপরোক্ত মতের সমর্থন জানায়, (৩) মানব জীবনে দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত বিধায় কোনটাকেই অস্বীকার বা অবহেলা করা যায় না। বুঝতে কঠিন হয় না যে, যার দেহ আছে তার দৈহিক জীবনও আছে। মানুষ সমাজ-নির্ভর জীব। অভিধানের ভাষায় সমাজের সংজ্ঞা হলো 'পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাসকারী মনুষ্য গোষ্ঠি।' (সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী)। সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভিতই হলো নৈতিকতা। কথাটা ঘুরিয়ে বলা যায় যে, নৈতিকতাই সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত। স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসবের যে কোনটাকে জীবন থেকে বিদায় দিলে বা অবহেলা করলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যেমন, কেউ কোনক্রমে যদি একটি পা সামান্য লম্বা বা খাটো করতে সমর্থ হয় তবে তাকে খুঁড়িয়েই চলতে হবে। শুধু দৈহিকই নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যাতে খোঁড়াতে না হয় সেদিকে সদা সজাগ ও সক্রিয় দৃষ্টি রাখতে হবে ও (৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগমন যত দ্রুত ও ব্যাপকই হোক না কেন, তা শুধু বৈষয়িক ব্যাপারে (ভাল বা মন্দ যে কোনটার জন্য) মানুষের সহায়ক হয়ে থাকে। তা আপ্‌ছে (automatically) কখনও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এটি একটি ঐতিহাসিক তথা সর্বকালের সত্য। যে কোন আদর্শের বেলাতেও একথা খাঁটে। শুধু বিশ্বাসের দরুনই আদর্শ কার্যকর হয় না। নিষ্ঠা এবং সক্রিয় ও সম্মিলিতভাবে অনুসরণ দ্বারাই আদর্শকে কার্যকর রাখতে হয়। ধর্মীয় আদর্শের অনুসরণ দ্বারাই আদর্শকে কার্যকর রাখতে হয়। ধর্মীয় আদর্শের ব্যাপারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন আদর্শগত কারণে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করেছে। যারা ইসলাম বিশ্বাস করে না বা এর বিরোধিতা করে তারা হলো অবিশ্বাসী বা কাফের। যারা বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামকে অনুসরণ করে তারা হলেন মু'মিন। যারা হীন স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে তারা হলো মুনাফিক। ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফিকেরা বড়ই ঘৃণার পাত্র।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ধর্মের সম্পর্ক আরো স্পষ্ট করার জন্য আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে কিছু উদাহরণ নেয়া যাক। কোন ব্যক্তি পুরাতন পদ্ধতিতে তৈরী খাদ্য খায়, পুরাতন ফ্যাশনের পোষাক পরে, অনুন্নত যান-বাহনে চলাফেরা করে। অপর কোন ব্যক্তি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে তৈরী খাবার খায়, (যাতে হয়তো নতুনত্ব আছে), হাল ফ্যাশনের পোষাকে নিজেকে সজ্জিত এবং অত্যাধুনিক যান-বাহনে চলাফেরা করে। এ অবস্থায় বলা যাবে না যে, এসব কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম ব্যক্তি হতে উন্নত মানের হবেই। তার চেয়ে বরং অনেক নিম্নমানেরও হতে পারে। তা'ছাড়া উভয়েই উচ্চ বা নিম্নমানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের গ্যারান্টি হতো তবে তা এ যুগের পত্রিকাদি সুনীতি ও সুসংবাদে ভরপুর থাকতো; বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলোতে। বাস্তবে এখন সব দেশেই এর বিপরীত চিত্রই দেখা যায়। অর্থাৎ সবদেশেই দুর্নীতি ও দুঃসংবাদের প্রাধান্য চলছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে কলংকিত করছে। একবিংশ শতাব্দীর জন্যও শুভ-বার্তা বহনের তেমন কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও কোন আশার উদ্রেক করছে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মেধা বা বিদ্যা অর্জন দ্বারা মানুষ জ্ঞানী বা কোন বিষয়ে বিশারদ হতে পারে। এসবের বলেই আপ্‌ছে কেউ সৎ মানুষ ও সমাজ হিতৈষী হতে পারে না। এজন্য মানুষকে তার শক্তি সামর্থ্য সব কিছু কোন মহৎ আদর্শ ও সেবামুখী করে গড়ে তুলতে হয়।

এ যমানার অবক্ষয় ভয়াবহ সামগ্রিক রূপ ধারণ করেছে। এর বিস্তার সব সীমা অতিক্রম করেও সব রেকর্ড ভঙ্গ করছে। ফলে বিশ্বব্যাপী (ধনী-নির্ধন সব দেশেই) চরিত্রের মহাদুর্ভিক্ষ প্রকট হয়ে উঠেছে। এ যুগের অবক্ষয়ের রূপের কোন শেষ নেই। কোন্ রূপটি যে প্রধান স্থান পাবে তা বলা দুষ্কর। যে অবক্ষয় আমাদের পরম স্নেহের ধন নিষ্পাপ নির্মল কচি শিশুদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে তা নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক। প্রথমে একটি পুরো পেপার কাটিং ও তৎপর কিছু পেপার কাটিংয়ের অংশ বিশেষ দেয়া হলো ঃ

Brutal indeed !

Gaibandha : April 27 : A 14 month old baby was allegedly brutally raped by a youth of sadar thana of the district on Tuesday, reports UNB.

According to witnesses, the girl Sima daughter of Shafiqur Rahman was violated by the hoodlum Tajul, 19 son of Kuddus of village Progatipara west kamarnal of Sadar thana at noon.

The baby was rushed to the hospital in a critical condition.

Village elders were said to be trying to hide the matter considering the future of the baby and hence no case has yet been registered with the police. (28.4.94 The Daily Star.)

রাজধানীতে আবার এক শিশুকে ধর্ষণ ॥ স্কুল ছাত্র গ্রেফতার

(দৈনিক জনকণ্ঠ ৪.৫.৯৮)

ঢাকা রিপোর্টার ঃ রাজধানীতে আবারো এক শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ক্যান্টনমেন্ট থানার কুড়িল এলাকায় ধর্ষণের শিকার হয়েছে আড়াই বছরের শিশু লিজা। পুলিশ এ ঘটনায় এক স্কুল ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। লিজাকে ভর্তি করা হয়েছে সিএমএইচ-এ।

লিজাদের পাশের বাসাতেই রনিরা থাকে। আদর করার ছলে রনি এক পর্যায়ে লিজাকে ধর্ষণ করে। এরপর তাকে বাসায় রেখে যায়। একদিন এইভাবে চলে যাবার পর লিজা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। গোপন অঙ্গে ব্যথায় ছটফট করতে থাকলে লিজার পিতা-মাতা বিষয়টি জিজ্ঞাসা করেন। আধো-আধো কথায় লিজা তার ব্যথার কারণ জানায়। এরপর লিজাকে নিয়ে যাওয় হয় সিএমএইচ-এ। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান লিজাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। লিজার পিতা এরপর ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ পাশের বাড়ির ছেলে রনিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ বলেছে, রনি ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। তার পিতার নাম জিল্লুর রহমান। রনির পিতা গার্মেন্টসে চাকরি করেন। লিজার পারিবারিক সূত্র বলেছে, ধর্ষণের ঘটনা প্রথমে তাঁরা বুঝতে পারেন নি। কারণ শিশুটি কোনভাবেই বিষয়টি বুঝাতে পারছিল না। কিন্তু চিকিৎসক ধর্ষণের তথ্য জানান। লিজার বাবা-মা চাকরিজীবী। ঘটনার দিন তাঁরা কর্মস্থলে ছিলেন। আর শিশুটি খেলা করছিল বাড়ির আঙ্গিনায়। এই ফাঁকে রনি শিশুটিকে নিয়ে নিজের বাসায় ধর্ষণ করে। গ্রেফতারকৃত রনিও অবশ্য দোষ স্বীকার করেছে। তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। কোন কোন পত্রিকায় শিশুটির বয়স দু'বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাক্ সে কথা। এখানে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত কিছু খবরের হেড লাইন দিয়ে মন্তব্য পেশ করা হচ্ছে। (৩) হেড লাইনস্-এর পর খবরের দু'একটি কথা উল্লেখ করা হলো ঃ (ক) পিতার হাতে কন্যা ধর্ষিত

মানিকগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ঃ চরিত্রহীন লম্পট পিতা ধর্ষণ করেছে নিজ ঔরষজাত কন্যা চায়না আক্তার (১৩)কে। পুলিশ লম্পট হযরত আলীকে আটক করেছে (বাংলা বাজার পত্রিকা, ২.৫.৯৮)।

(খ) লম্পট শ্বশুরের ধর্ষণের শিকার পুত্রবধূ

সৌমিত্র মানব, সাভার থেকে ঃ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এক লম্পট শ্বশুর তার স্ত্রীর সহযোগিতায় ধর্ষণ করেছে আপন পুত্রবধুকে। ঘটনা ধামাচাপ দেয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে তা জানাজানি হয়ে যায় (বাংলা বাজার পত্রিকা, ২.৫.৯৮)।

(গ) পাকিস্তানে শিশুদের যৌন নিপীড়নের হার বাড়ছে।

খালিদ সাঈদ, করাচী থেকে

চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে মার্চ - এই তিন মাসে পাকিস্তানে ২২৫টি শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এর হোতা ৪৬৮ জন পুরুষ।

বিভিন্ন দেশের এ ধরনের খবরের বহু পেপার কাটিংস জমা হয়েছে। দু'টো **মুসলিম প্রধান দেশের** উদাহরণ দেয়ার কারণ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্‌র নামধারী মুসলমানরাও অবক্ষয়ে পেছনে নয় তা তুলে ধরা। এখানে এনিয়ে আলোচনা না বাড়ায়ে উদ্ধৃত খবরগুলো সম্পর্কে কিছু বলা যাক। যার মাঝে সামান্যতম নৈতিকতা বোধ আছে শিশুদের উপর এরূপ জঘন্য অত্যাচারে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। ধর্ষণকারীদের নাম বলে ওরা মুসলমান (!) কুরআনে আল্লাহ্ বেশ কিছু আয়াতে অবৈধ যৌন ক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং ইহ ও পরকালে এর জন্য শাস্তির কথা বলেছেন। এখানে একটি আয়াতের বাংলা তর্জমা দেয়া হলো ঃ 'এবং তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তীও হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ' (১৭ঃ৩৩)। কুরআনের এ শিক্ষা এ যুগেই নয় সর্বযুগের জন্য কল্যাণময়। বর্তমানে গণধর্ষণে কোন দেশ পেছনে পড়ে আছে এ দুর্নাম (!) দেয়া যাবে বলে মনে হয় না। যারা প্রাতিষ্ঠানিক পতিতালয়ের প্রসার দ্বারা এর প্রতিকারের কথা বলেন তাদের কাছে একটি প্রশ্নই রইল আপনাদের শিশুদেরকে কি ওসব 'আলয়ে' পাঠাতে রাজি আছেন ? তাদের চিন্তার দীনতা ও সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার মানসিকতা খুবই নিম্নমানের। বর্তমানে নারী ও শিশু পাচার আন্তর্জাতিকরূপ ধারণ করেছে। অশ্লীলতা নিত্য রূপ বদলাচ্ছে ও প্রসারতা লাভ করছে। অন্যান্য অবক্ষয়ের কিছু উল্লেখ করা যাক। ঘুষ, জুয়া, নেশা (বাংলা ১৪০৫ সালের প্রথম রাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে গাইবান্ধায় ৭০ জনের উপরে মৃত্যু বরণ ও ৫ শতাধিক লোকের বিষে আক্রান্ত হওয়া এবং অনেকের অন্ধত্বপ্রাপ্তি ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত বৈকি।) সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজী, বোমাবাজী, কালো বাজারী, মজুদদারী, চোরা চালানী, বিশ্বাসঘাতকতা, চুক্তিভঙ্গ, সন্ধির বরখেলাপী, আমানতের খেয়ানত, পরীক্ষায় গণ ও জোর করে নকল, প্রশপত্র ফাঁস, জাল, ভেজাল, প্রতারণা, যৌতুকের দাবী, এসিড নিক্ষেপ, সামান্য অজুহাতে খুন-খারাবি, বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে হানাহানি, কথায় কথায় যেখানে সেখানে ভাংচুর, শহরে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন দলের মাঝে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া নিত্য দিনের সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

চুরি-ডাকাতি তা নিতান্ত সেকেলে ব্যাপার। প্রতিযোগিতায় মনে হয় 'আইয়্যামে জাহেলিয়ত' ও নিজের অযোগ্যতার কারণে শরমে মুখ লুকোবে !

প্রসংগতঃ অবক্ষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। ক্ষয় লয় প্রকৃতির চিরন্তন বিধান যা সর্বত্র বিরাজিত। জীব ও জড় কোন কিছুই তা এড়াতে পারে না। সৃষ্টির সেরা মানুষও নয়। অবক্ষয় যেন শুধু মানুষের বেলাতেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ যে ক্ষয় হওয়া উচিত নয় এবং যা সদা সবার জন্য অমঙ্গলের উৎস হয়ে দাঁড়ায় সে ক্ষয়কেই অবক্ষয় বলা যায়। এ হিসেবে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতনই হলো বড় অবক্ষয়। এর দ্বারা মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী আক্রান্ত হয় বলে মনে হয় না। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, গুরুত্ব দেয়ার জন্য আবারও বলছি জড় জগতে তো নয়ই মানুষ ছাড়া প্রাণী জগতেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষ দেখা যায় না। আর থাকলেও তা যে অতি ক্ষীণ ও সীমিত এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

(চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

বাইবেলের শিক্ষা ও খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস

হযরত যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের ভিতর যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে পবিত্র বাইবেল হতে তার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। হযরত যীশু খ্রীষ্টের কোন কোন বানীর প্রকৃত অর্থ খ্রীষ্টানগন ভুল বুঝার ফলে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তারা বাইবেলের বিপরীত বিশ্বাস প্রচার করে আসছেন। হযরত যিশু খ্রীষ্ট ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের ভিতর যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে পবিত্র বাইবেলের আলোকে তা আলোচনা করলে পাঠক দেখতে পাবেন যে, এ সকল বিশ্বাসের মূলে আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

১. বাইবেল বলে যীশু ঈশ্বর নহেন

খ্রীষ্টানগণ বলেন "যীশুই ঈশ্বর" এবং তারা প্রচার করেন, "যদিও তিনি সৃষ্টিকর্তা তবুও আমাদের প্রতি তাঁর প্রেম তাঁকে মানবাকারে এ জগতে নেমে আসতে বাধ্য করেছে। প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্বে তিনি মাংসে মূর্তিমান হয়ে মনুষ্যবৎ আমাদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। এই দেহধারী ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টরূপে বৈৎহেলহামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন" (কোন্ ঔষধ প্রচার পুস্তিকা)। কিন্তু যীশু বলেছিলেন, "আর যদি আমি বিচার করি আমার বিচার সত্য, কেননা, আমি একা নই, কিন্তু আমি আছি আমার পিতা আছেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আর তোমাদের ব্যবস্থাতেই লিখিত আছে দুইজনের সাক্ষ্য সত্য। আমি আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেই আর আমার পিতা তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন" (যোহন-৮ঃ ১৬-১৮)।

পাঠক, উপরের উদ্ধৃতি হতে দেখতে পেলেন যীশু খ্রীষ্ট পরিষ্কার বলেছেন তিনিও ঈশ্বর দু'জন এবং তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত মাত্র। যীশু নিজেই ঈশ্বর হলে কেন বললেন, "আমি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেই আর আমার পিতা তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।" এবং তৎপূর্বে বলছেন, "শাস্ত্রের শিক্ষানুযায়ী দু'জনের সাক্ষ্য সত্য।" তিনি আরও বলেছেন, "আমি আছি, আমার পিতা আছেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" যীশু নিজেই ঈশ্বর হলে 'যিনি' কাকে বললেন, এবং তাঁকে পাঠালেনই বা কে ? "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" বলায় সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত ঈশ্বর নহেন। নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানেও যীশু নিজেকে ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত বলেছেন। দেখুন, "আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে সে তাঁকেই অগ্রাহ্য করে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন" (লুক ১০ঃ১৬)।

"আর আমি আপনা হতে বলি নাই কিন্তু কি কইব, কি বলব তা আমার পিতা। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে আজ্ঞা করেছেন" (যোহন ১২ঃ৪)। অতএব যীশু প্রেরিত তিনি নিজেই ঈশ্বর হলে প্রেরক কে ?

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যীশু যাকে পিতা বলে সম্বোধন করেছেন তাঁকে যেমন নিজের পিতা বলেছেন তদ্রূপ তাঁর অনুগামীদেরও পিতা বলেছেন। যীশু বলেছেন, "তুমি আমার ভ্রাতৃগণের নিকট গিয়ে তাদেরকে বল যিনি আমার পিতা ও তোমাদেরও পিতা এবং আমার ঈশ্বরও তোমাদেরও ঈশ্বর, তাঁর নিকট যাচ্ছি" (যোহন ২০ঃ৩৭)। এখানে যেমন তিনি তাঁকে নিজের ঈশ্বরও অন্যদেরও ঈশ্বর বলেছেন। যীশু নিজেই ঈশ্বর হলে তাঁর ঈশ্বর কে ? তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন, "হে ঈস্রাঈল শুন, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একই প্রভু" (যোহন ১২ঃ২৯)। এখানে আমাদের প্রভু বলায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, যীশু কখনও নিজেকে ঈশ্বর বা সদা প্রভু বলে মান্য করার শিক্ষা দেন নি বরং তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের একই প্রভুকে বা সেই সদাপ্রভুকে প্রেম করবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটাই তাঁর সকল আজ্ঞার প্রথম আজ্ঞা বলেছেন (মার্ক ১২ঃ২৯-৩০)। যীশু নিজেও সেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি নিজেই ঈশ্বর হলে ফরিশীদের নিকট বন্দী হবার পুর্বে তিনি ব্যাকুল হয়ে কোন্ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং এই প্রার্থনার প্রয়োজনই বা হ'ল কেন ?

যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস বর্তমান খ্রীষ্টানগণ করেন তৎকালীন ইহুদীগণও মনে করত যে, তিনি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন। যীশু নিজেই তা খন্ডন করেন এবং ঈশ্বরত্বের দাবী অস্বীকার করেন। যেমন বাইবেল বলে, "যিহুদীরা তাঁকে এই উত্তর দিল, উত্তম কার্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বর নিন্দার জন্য, কারণ তুমি মানুষ হয়ে আপনাকে ঈশ্বর করে তুলছ এই জন্য। যীশু তাদেরকে উত্তর করলেন, তোমাদের ব্যবস্থায় কি লেখা নাই,। " আমরা বললাম, তোমরা ঈশ্বর ? (গীত ৮২ঃ৬)। যাদের নিকট ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদেরকে ঈশ্বর বললেন, আর শাস্ত্রের খন্ডনতো হতে পারে না তবে পিতা যাকে পবিত্র করলেন ও জগতে প্রেরণ করলেন, তোমরা কি তাকে বল যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করছ। কেননা, আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র ?" (যোহন ১৩ঃ৩৩-৩৬)। পাঠক, দেখলেন যীশু কীভাবে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের ঈশ্বরত্বের দাবি খন্ডন করলেন। শাস্ত্রের যে উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হয়েছে তা গীত সংহিতায় আছে। সেখানে ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র বলা হয়েছে। যীশু বলছেন, শাস্ত্র ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র বলায় যদি তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র না হন তবে তিনি কীরূপে ঈশ্বর পুত্র বলায় ঈশ্বরের নিন্দা করলেন। গীতের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। গীত বলে, "ঈশ্বর ঈশ্বরের মন্ডলীতে দন্ডায়মান। তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে বিচার করেন" (৮২ঃ১)। আরও দেখুন "আমিই বলেছি তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান; কিন্তু তোমরা মনুষ্যের ন্যায় মরবে, একজন অধ্যক্ষের ন্যায় পতিত হবে" (ঐ ৮২ঃ৬৭)। লুকের ৩ঃ৩৮ আয়াতে আদমকেও ঈশ্বর পুত্র বলা হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের অনেক স্থানেই মনুষ্যদেরকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বের পুত্র বলায় যেমন তারা প্রকৃত ঈশ্বর হয়ে যান নি যীশুও নিজেকে ঈশ্বর পুত্র বলায় প্রকৃত ঈশ্বর হননি। প্রতি স্থানেই ঈশ্বরের বাণী লাভের জন্য তাদের রূপকভাবে ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র বলা হয়েছে। অনুরূপভাবেই যীশুও নিজেকে ঈশ্বর পুত্র বলেছেন। প্রকৃত ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র বলেন নি।

বাইবেলের যে সকল আয়াত দ্বারা যীশুকে ঈশ্বর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তা' পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে, সে সকল কথা দ্বারা যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয় না। যীশুর তত্ত্বগত কথা ভুল বুঝবার ফলেই তাঁকে ঈশ্বরের পদে উন্নীত করা হয়েছে। বস্তুতঃ নতুন নিয়মের অধিকাংশ স্থলেই যীশু উপমা দ্বারা কথা বলেছেন। যীশু নিজেই যেখানে ঈশ্বরের দাবী অস্বীকার করেছেন (যোহন ১০ ঃ ৩৩-৩৬)। সেখানে অন্য স্থানে 'তিনিই ঈশ্বর এরূপ পরস্পর বিরোধী কথা

তিনি কীরূপে বললেন ? কেননা, ঈশ্বর প্রেরিত কোন ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী কথা বলতে পারেন না এবং তাঁদের আনিত কিতাবেও এরূপ পরস্পর বিরোধী কথা থাকতে পারে না। যে সকল স্থানে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন সেখানে উপমা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রিয়া নিজের উপরে প্রতিফলিত বলতে চেয়েছেন, বুঝতে হবে। যীশু বলেছেন, "আমি উপমা দ্বারা এ সকল কথা তোমাদের বল্‌লাম, এমন সময় আসছে যখন তোমাদেরকে আর উপমা দ্বারা বলব না কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় জানাব" (যোহন ১৩ঃ২৫)। বাইবেলে এরূপ উপমার অভাব নেই। যেমন একস্থানে যীশু বলেন, "আমি জীবন খাদ্য" (যোহন ৬ঃ৩৫)। অন্যস্থানে বলেন, "আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস জীব জগতের খাদ্য" (ঐ ৬ঃ৫১)। যখন ইহুদীরা এরূপ কথা না বুঝার কারণে পরস্পর বাক্‌যুদ্ধ করছিল তখন তিনি বলেন, "সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তার রক্ত পান না কর, তোমাদের জীবন নেই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন পেয়েছে। এবং আমি তাকে শেষ দিন উঠাব। কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়" (যোহন ৬ঃ৫২-৫৫)। আশা করি খ্রীষ্টানগণ এখানে যীশুর মাংস ও রক্ত বলতে তাঁর প্রকৃত মাংস ও রক্ত বোঝেন না। এখানে যীশু তাঁর শিক্ষাকে জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত দ্বারা অনন্ত জীবন লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ যে সকল স্থানে যীশু "আমিই তিনি" "আমি ও পিতা আমরা এক" (যোহন ৮ঃ২৪, ১০-৩০) ইত্যাদি বলেছেন। প্রতিস্থলেই তিনি তাঁর ভিতর ঈশ্বরের শিক্ষাকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করেছেন বলে উপমা স্থাপন করেছেন। যীশু নিজেকে যেমন "আমিই তিনি বলেছেন"। তদ্রূপ তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, "এখন হতে ঘটবার পূর্বে আমি তোমাদের বলে রাখছি যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করবে আমিই তিনি। সত্য সত্য আমি তোমাদের বলছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই তাকে যে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" (যোহন ১৩ঃ১৯-২০)। একই কারণে তিনি অন্যত্র বলেছেন, "যে তোমাদেরকে মানে, সে আমাকেই মানে, এবং যে তোমাদেরকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন" (লুক ১০ঃ১৬)। তিনি আরও বলেছেন "এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁকেই দর্শন করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" (যোহন ১২ঃ৪৫)। উক্ত পদসমূহ হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যে অর্থে যীশুর প্রেরিতদের গ্রহণ করলে যীশুকেই গ্রহণ করা হয়, সেই অর্থেই যীশুকে গ্রহণ করলে ঈশ্বর গ্রহণ করা হয়। এর দ্বারা যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয় না।

বাইবেলের নিম্নের বাণী দ্বারাও যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণের চেষ্টার করা হল। কিন্তু পদটি পর্যালোচনা করলে পাঠক দেখতে পাবেন যে, উহারও কোন ভিত্তি নেই। বাইবেলের নতুন নিয়মের এক স্থানে বলা হয়েছে, "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন" (যোহন ১ঃ১-২)। এর কয়েক পদ পরেই আবার বলা হয়েছে, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রকাশ করলেন" (যোহন ১ঃ১৪)। শেষের পদটি পূর্বের পদ দু'টির অর্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে। দ্বিতীয় পদ হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মাংসে মূর্তিমান যীশু ঈশ্বরের নিকট "যীশু" এই বাক্য হিসাবে ছিলেন। ঈশ্বর যীশুকে সৃষ্টি করবেন এরূপ পরিকল্পনা সৃষ্টির সময়েই করেছিলেন। তজ্জন্য বলা হয়েছে, "আদিতে বাক্য ছিলেনঃ। যেহেতু বাক্য নির্জীব কথা মাত্র। ইচ্ছাও কণ্ঠস্বরের বলিষ্ঠতা দ্বারা তার শক্তি প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারা কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। ইশ্বর যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তা' প্রথমে তাঁর মনে ইচ্ছারূপে উদয় হয় এবং তাই প্রকাশ করার জন্য সৃষ্ট বস্তুর নাম রূপ বাক্য ব্যবহার করেন। যেমন, সৃষ্টির প্রথমে তিনি বলেছিলেন, "দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল" (আদি ১ঃ৩)। কেবল দীপ্তি রূপ বাক্য হতে আলোর প্রকাশ হয়নি। ঈশ্বরের অন্তরে প্রথমে আলো লাভের বাসনা সৃষ্টি হয় এবং তা প্রকাশ করার জন্য তিনি "দীপ্তি হউক" বাক্য ব্যবহার করেন ও আলোর সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিই এভাবেই হয়ে থাকে যে, কোন সৃষ্টিই প্রথমে বাক্যাকারে প্রকাশ পায় তো পরে স্রষ্টা বস্তুরূপে মূর্তিমান হয়। যীশুও পূর্বে যীশুরূপ বাক্যরূপে ঈশ্বরের অন্তরে লুক্কায়িত ছিলেন পরে যখন তাঁকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয় তখন যীশুরূপ মানুষকে সৃষ্টি করেন। ইহাই উক্ত আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। প্রকৃত প্রস্তাবে যোহনের ১ঃ১-১৪ পদসমূহ পাঠ করলে পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এর প্রতিটি পদেই রূপকের ব্যবহার হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বরের বাণীতে রূপকের ব্যবহারই বেশী, সুতরাং বাইবেলের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে জ্ঞান দ্বারা তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ঈশ্বরের কোন কথা অযৌক্তিক বা অমূলক নয়। জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করলেই তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায়। অবশ্য এর জন্য ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন। যে প্রকৃত অর্থ বুঝার জন্য চিন্তা-শক্তি প্রয়োগ করে ঈশ্বর তার নিকট প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেন। মুক্ত মন নিয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলেই ঈশ্বরের সাহায্য আসে ও প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। বাইবেলের অনুসারীগণ সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য অন্ধ বিশ্বাসের উপর না থেকে গভীর চিন্তা দ্বারা বাইবেল বুঝার চেষ্টা করলেই তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবে। (চলবে)

– খন্দকার আজমল হক

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

মোকাররম আব্দুল মাজেদ তাহের, লন্ডন

(সপ্তম কিস্তি)

পবিত্র রমযানের শেষ দশক ঃ

*... হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সল্লাঃ) (রমযানের) শেষ দশকে প্রবেশ করতেন তো কোমর বেঁধে নিতেন অর্থাৎ আরও তৎপর হতেন এবং স্বীয় রাতওলোকে (ইবাদতে জাগরিত করে) জীবিত করতেন এবং তাঁর (সল্লাঃ) গৃহবাসীদেরকেও জাগ্রত করতেন (বুখারী কিতাবুস্ সওম)।

যখন কোন প্রিয় জিনিষের বিদায়ের প্রহর ঘনিয়ে আসে তখন বাধা-বন্ধনহীন প্রেমের আবেগ উছলিয়ে ওঠে। এমন একটি অবস্থা আমাদের প্রভু ও নেতা আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর হোত রমযানকে বিদায় দিতে। যখনই আধ্যাত্মিক বসন্ত নিজস্ব জাঁকজমক দেখিয়ে বিদায় নেবার পালায় চলে আসতো তখন এ শেষ দিনগুলোতে তিনি কোমর বেঁধে নিতেন এবং রমযানের কল্যাণরাশি লাভ করার জন্যে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করতেন না।

*... হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপর একটি বর্ণনা এই যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) রমযানের শেষ দশকে ইবাদতে এত চেষ্টা ও পরিশ্রম এবং সাধ্য-সাধনা করতেন যে, এত চেষ্টা-সাধনা আর কখনও করতে দেখা যেতো না (ইবনে মাজাহ্)।

জানা যায় যে, একেতো হুযূর (সল্লাঃ) রমযানের বিদায়ের কথা মনে করে যে, পুনরায় এ প্রিয় কল্যাণমন্ডিত মাস আবার ১ বছর পর আসবে, পূর্ণ সাহস ও শক্তি ব্যয় করে ঐসব কল্যাণ লাভ করার জন্য চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্তালার পক্ষ থেকে এ শেষ দিনগুলোতে যে বিশেষ কল্যাণরাশি রাখা হয়েছে ওগুলোকে লাভ করাও উদ্দেশ্য থাকতো।

শেষ দশকে আঁ হযরত (সাঃ) ই'তিকাফে বসতেন আর লায়লাতুল কদরের অন্বেষণে রাতগুলোকে জাগরিত করতেন (ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে)।

অশ্রুপাত ও দোয়ার ঝর্ণাধারা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন, "যখন রমযান শেষ প্রান্তের দিকে চলে আসে তখন এর অবস্থা এই রকম হয় যেভাবে ঝর্ণার নিকটবর্তী পানির প্রবাহ হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি চঞ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি হয় আর রমযানের শেষ দশ দিনেতো মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অশ্রুপাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে যায়। ইহা অন্তর থেকে প্রস্ফুটিত হয়।"

তিনি (আইঃ) বলেন, "যে দিনগুলো অবশিষ্ট ঐ দিনগুলোর প্রতি যত্নবান হোন এবং ওগুলোকে এমনভাবে নিজের মত করে কাটিয়ে দিন যেন ঐ দিনগুলো আপনার নিকট আদরের দিনে পরিণত হয় আর ঐ দিনগুলো এমনভাবে নিজের মত করে কাটান যে, ঐ দিনগুলোর কল্যাণরাজি আপনার সাথে গ্রথিত হয়ে যায়" (খুতবা জুমুআ ২-২-১৯৯৪ইং)।

*... পুনরায় তিনি বলেন, "যতই রমযানের দিনগুলো কেটে যেতে থাকে আর ভিজতে আরম্ভ করে দেয়, যখন শেষের দিকে এবং ঈদের নিকটবর্তী হতে থাকে তখন অশ্রুতে ভিজতে থাকে। যত বেশী আপনি রমযানের দিন কাটাতে থাকবেন তত বেশী ইহা ভিজতে থাকে। খোদাতাআলার সাথে ভালবাসার এক বিশেষ চমক সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্তাআলার সাথে এক গভীর সম্পর্ক মানুষ অনুভব করতে থাকে। কখনও কখনও সে ইহা মনে করে যে, ইহাই আমার জীবনের শেষ দিন হলে ভাল হোত। কেননা, খোদাতালার পক্ষ থেকে তার বিশেষ অনুগ্রহ ও ভালবাসার বিকাশ লাভের সৌভাগ্য হয়ে থাকে। আর খোদার অনুগ্রহের ছিঁটা সাধারণতঃ অন্য মাসে এত বেশী পরিমাণে নিক্ষেপ করা হয় না। ইহা বিশ্বের প্রত্যেক কোণে ও প্রত্যেক দেশে বর্ষিত হয় আর যার ওপরেই নিপতিত হয় তাকে সৌভাগ্যবান বানিয়ে দেয়" (খুতবা জুমুআ, ১৫-৪-১৯৮৮ইং)।

*... পবিত্র রমযানের এ দশকের আরও একটি কল্যাণ আঁ হযরত (সল্লাঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, "রমযানের শেষ রাতে আমার উম্মতের ক্ষমার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁর (সল্লাঃ) নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! রমযানের শেষ রাতে কি লায়লাতুল কদর হয়ে থাকে ? তিনি (সল্লাঃ) বলেন, না, বরং সৎকর্ম পালনকারী যখন সৎকর্ম করা থেকে অবসর লাভ করে তখন তাকে উহার প্রতিদান দেয়া হয়ে থাকে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

রমযানের ইবাদত ও সৎকর্মসমূহ থেকে অবসর লাভের পরে ঐ মু'মিন বান্দাগণকে শেষ রাতে আল্লাহ্তাআলা স্বীয় ক্ষমা প্রদান করে থাকেন। ঐ মু'মিনগণ আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর উত্তম আদর্শের অনুসরণে সৎকর্ম করতে করতে নিজেদের ইবাদতে পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করে থাকেন আর তাদের রাতগুলোকে আল্লাহ্র স্মরণে জীবিত করেন।

সুতরাং ঐসব লোক কতই না কল্যাণমন্ডিত যারা রোযাদার এবং রমযানের ইবাদতসমূহ পালনকারী। এঁদেরকে ত্বরিৎ তাঁদের প্রতিদান প্রদান করা হয়।

ই'তিকাফ ও উহার নিয়ম-কানুন ঃ

ই'তিকাফ-এর আভিধানিক অর্থ হলো–কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বা অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় ইবাদতের উদ্দেশ্যে রোযা রেখে মসজিদে অবস্থান করার নাম ই'তিকাফ।

রোযার ন্যায় ই'তিকাফের কথাও অন্যান্য ধর্মে পাওয়া যায়। যেভাবে কুরআন করীমে এসেছে- ওয়া 'আহিদনা ইলা ইব্রাহীমা ওয়া ইসমাঈলা আন ত্বহ্হিরা বায়তিয়া লিত্বইফীনা ওয়াল আকিফীনা ওয়ার রুক্কাইস্ সুজূদ – আমরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করেছিলাম, 'তোমরা উভয়েই আমার গৃহকে তওওয়াফকারী (প্রদক্ষিণকারী) ও ই'তিকাফকারী ও রুকূকারী এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করিও (সূরা বাকারা, ১২৬ আয়াত)।

*... আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের দিনগুলোতে পার্থিব কাজ-কর্ম থেকে পৃথক হয়ে হেরা গুহায় গিয়ে তাঁর বিভু-স্মরণে লিপ্ত থাকাও এ ধরনের ই'তিকাফই ছিলো। মানুষ যেদিন চায় যখন চায় ই'তিকাফে বসতে পাবে। কিন্তু রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসা সুন্নতসম্মত।

*... আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর ই'তিকাফের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

"আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর আমৃত্যু এ রীতি ছিলো যে, তিনি (সল্লাঃ) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসতেন। তাঁর (সল্লাঃ) মৃত্যুর পরে তাঁর পবিত্র স্ত্রী-গণও এ সুন্নতের অনুকরণ করতেন" (সহী মুসলিম কিতাবুল ই'তিকাফ বাবু ই'তিকাফিল আশরাফিল আওয়াখির)।

*... লায়লাতুল কদর-এর অন্বেষণে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদেকে আঁ হযরত (সল্লাঃ) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসতে নির্দেশ দিয়ে থাকতেন। সুতরাং তিনি একবার বলেন যে, "আমাকে একবার বলা হলো যে, লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকে নিহিত। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ই'তিকাফে বসতে চায় সে যেন এ দশকে বসে।"সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর সাথে শেষ দশকে ই'তিকাফে বসলেন।

কতদিনের ই'তিকাফে বসা উচিত ঃ

ই'তিকাফ-এর জন্যে কোন সময়-সীমা নির্ধারিত নেই। ই'তিকাফে যিনি বসেন তার ইচ্ছার ওপরে ইহা নির্ভর করে। যতদিন বসতে চায় বসতে পারে। আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবন থেকে প্রাপ্ত মসনূন (দলীল দ্বারা সাব্যস্ত) রীতি এই যে, কমপক্ষে যেন দশ দিনের ই'তিকাফে বসা হয়। হাদীসে এসেছে হুযূর (সঃ) রযমান মাসে সর্বদা দশ দিন ই'তিকাফে বসতেন। কিন্তু যে বছর তিনি (সল্লাঃ) ইন্তেকাল করেন সে বছর তিনি (সল্লাঃ) ২০ দিনের ই'তিকাফে বসেন।"

ই'তিকাফ কবে আরম্ভ হবে ঃ

২০শে রমযানের ফজরের নামাযের পর থেকে ই'তিকাফ আরম্ভ করা উচিত। কেননা, আঁ হযরত ((সল্লাঃ) -এর সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি ১০ দিনের ই'তিকাফ করতেন। আর দশ দিন ঐভাবে পূর্ণ হতে পারে যখন কিনা ২০শে রমযানের সকাল বেলা থেকে ই'তিকাফে বসা হয় এবং ঈদের চাঁদ দেখা গেলে মু'তাকিফ (যিনি ই'তিকাফ করেন)-এর ই'তিকাফ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

*... আঁ হযরত (সল্লাঃ) ফজরের নামাযের পরে স্বীয় ই'তিকাফে নিয়োজিত হয়ে যেতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "রসূলুল্লাহ্ (সল্লাঃ) যখন ই'তিকাফের আকাঙ্ক্ষা করতেন তখন ফজরের নামায আদায় করার পরে নিজের ঐ ই'তিকাফের স্থানে চলে যেতেন যা এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হতো।"

*... হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন –

"ই'তিকাফে ২০ তারিখে সকাল বেলা বসা হয়। কখনও ১০ দিন হয়ে যায় কখনও ১১ দিন" (আল্ ফযল ৩-১১-১৯১৪ইং)

কোন স্থানে ই'তিকাফ করা যায় ঃ

ই'তিকাফের জন্যে পসন্দ মত ও উপযুক্ত স্থান হলো জামে মসজিদ (যেখানে জুমুআর নামায পড়া হয়–অনুবাদক)। যেভাবে কুরআন করীমে উল্লেখ এসেছে যে,

"ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ"– (অর্থঃ তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করো-সূরা বাকারা ঃ ১৮৮ আয়াতাংশ–অনুবাদক)

কেননা, মসজিদই আল্লাহ্তাআলার যিক্র ও তাঁর ইবাদতের জন্যে বিশেষভাবে নির্ধারিত স্থান। আর মসজিদেই ই'তিকাফে বসার জন্যে আ-হাদীসে নির্দেশ এসেছে। সুতরাং হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

"লা ই'তিকাফা ইল্লা ফী মাসজিদল জামে" (অর্থ ঃ জামে মসজিদ ব্যতিরেক ই'তিকাফ নেই – অনুবাদক) (আবূ দাউদ কিতাবুল ই'তিকাফ বাবুল মু'তাকিফ ই'য়াউদুল মারীয)

ইমামগণ এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য যে, ই'তিকাফ এমন মসজিদে হ'তে পারে যেখানে বা-জামাত নামায হয়ে থাকে। অপারগতার কারণে মসজিদের বাইরেও ই'তিকাফ হতে পারে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন,

"মসজিদের বাইরে ই'তিকাফ হতে পারে কিন্তু মসজিদে ই'তিকাফ করার মত পুণ্য লাভ হতে পারে না। যখন যথানিয়মে সাধারণ মসজিদে ব্যবস্থা না হয় যেমন, কোথাও একা একজন আহমদী থাকে অথবা স্থানীয় জামাতের লোকেরা কোন ভাই-এর ঘরে নামায পড়ে থাকে সেক্ষেত্রে নিজের ঘরে এমন স্থানে, যা কিনা সাধারণভাবে নামাযের জন্যে নির্ধারিত করে নেয়া হয়েছে, ই'তিকাফে বসা যায়। অপারগতার অবস্থা আল্লাহ্তাআলা অবহিত আছেন। আর তিনি বান্দার নিয়্যত অনুযায়ী কর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

মহিলারাও মসজিদে ই'তিকাফে বসতে পারেন। যদি কোন স্থানে মসজিদ না থাকে বা মসজিদে মহিলাদের থাকার সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে ঘরে নামাযের জন্যে একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করতঃ সেখানে ই'তিকাফে বসা তাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলজনক। ই'তিকাফের দিনগুলোতে যদি মহিলাদের বিশেষ দিন আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে তারা যেন ই'তিকাফ পরিত্যাগ করে। এ অবস্থায় তাদের মসজিদে থাকা বাঞ্ছণীয় নয়।"

ই'তিকাফের জন্যে কি রোযা রাখার শর্ত আছে ?

সাধারণ অবস্থায় ই'তিকাফের জন্যে রোযা রাখা প্রয়োজনীয় শর্তের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ সঠিক নয়। রেওয়ায়াতের শব্দগুলো এরকম **লা ই'তিকাফা ইল্লা বিস্ সওম** অর্থাৎ রোযা ব্যতিরেকে ই'তিকাফ নেই। সুন্না আতিম্মুস্ সিয়ামা ইলাল্লায়লি ওয়ালা তাবাশিরুহুন্না ওয়া আনতুম আকিফূনা ফিল মাসাজিদ – আয়াতে করীমার মাপকাঠিতে এ সম্বন্ধে সমর্থন পাওয়া যায়। ইহা ব্যতিরেকে এর ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) বা তাঁর (সল্লাঃ) সাহাবা (রাঃ) কখনও রোযা ব্যতিরেকে ই'তিকাফে বসেছেন। সাহারা (রাঃ)-এর মধ্য থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ও ইমামদের মধ্য থেকে ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম আওযাই (রহঃ)-এরও এ রীতি যে, ই'তিকাফের জন্যে রোযা থাকা আবশ্যক।

মু'তাফিক (ই'তিকাফ যিনি করেন) কি কি প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারেন ঃ

মু'তাফিকের জন্যে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে আর কোন কারণে মসজিদের বাইরে বের হওয়া জায়েয (বৈধ) নয়।

*... হাদীসে এসেছে যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) ই'তিকাফের অবস্থায় কেবল মানবীয় প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে (যেমন পায়খানা, প্রস্রাব, গোসল প্রভৃতি – অনুবাদক) ঘরে আসতেন না। (এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর ঘর মসজিদ সংলগ্ন ছিলো)।

*... পরিপূর্ণভাবে ইনকিতা (সংসার বর্জন) ই'তিকাফের উচ্চ মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন যে, সুন্নত অর্থাৎ আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর রীতির অনুসরণ ছিলো ইহাই যে, মু'তাফিফ মসজিদ থেকে যেন বাইরে না বেরোয় – রোগী দেখার জন্যেও নয় আর জানাযার নামাযে যোগ দেয়ার জন্যেও নয়। অবশ্যই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে (আবূ দাউদ, কিতাবুস সিয়াম, বাবুল মু'তাকিফ ই'য়াউদুল মারীয)।

মানবীয় প্রয়োজন বলতে কী বুঝায় ? এর একটি অর্থ হলো পায়খানায় যাওয়া। এ অর্থের ওপরে সকল আলেম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, ইহা এমন প্রয়োজন যে, এর জন্যে মসজিদ থেকে বাইরে আসা জরুরী। এভাবে যদি মহল্লার মসজিদে ই'তিকাফে বসা হয় তাহলে জুমুআ পড়ার জন্যে জামে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে আর ইহাকেও মানবীয় প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। এতদ্ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন যেমন, দরসুল কুরআন বা ইজতেমায়ী দোয়ায় অংশগ্রহণ, খাবার গ্রহণ করতে, জানাযার নামায পড়তে, কোন আত্মীয়ের অসুখ দেখতে যাওয়া বা কাউকে বিদায় দেবার জন্যে বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ এ ব্যাপারে মসজিদের বাইরে বেরোনোকে না-জায়েয মনে করেন আর ই'তিকাফের প্রাণও এ বিষয়ের প্রত্যাশী যে, এসব গৌণ প্রয়োজনাদির জন্যে মু'তাকিফ মসজিদ থেকে যেন বাইরে না আসে বরং পরিপূর্ণভাবে সংসার-বর্জনের অবস্থা নিজের ওপরে আরোপ করার চেষ্টা করেন। আর এ ধরনের আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষাসমূহকে উৎসর্গ করতে নিজে নিজে অভ্যস্ত হন। যাই হোক কতক ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদির মধ্যে কিছু ব্যাপকতা রয়েছে। আরও কতক প্রয়োজনাদির জন্যে মু'তাকিফ মসজিদের বাইরে যেতে পারে। কতক রেওয়ায়াত অনুযায়ীও ইঙ্গিতে এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, মানুষ আরও প্রয়োজনকে দৃষ্টিপটে রেখেও মসজিদের বাইরে যেতে পারে। যেমন, একবার হযরত সাফিয়া (রাঃ) রাত্রে তাঁর (সল্লাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে থাকেন। যখন ফিরে আসছিলেন তখন তিনি (সল্লাঃ) তাঁকে (রাঃ) ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসেন যদিও এঘর মসজিদ থেকে বেশ দূরে ছিলো (আবূ দাউদ, বাবুল মু'তাকিফ ইয়াদখুলুল বায়তা লেহাজাতিন)।

*... হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন "

"যখনই প্রাকৃতিক কাজ সারতে ঘরে আসতাম আর ঘরে কোন রুগী থাকতো সেক্ষেত্রে পথ চলতে চলতে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করতাম"।

(ইবনে মাজাহ্ কিতাবুস্ সওম বাবুন ফিল মু'তাকিফ ই'য়াউদুল মারীয)।

*... হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রুগী দেখার বৈধতার সম্বন্ধে যা লেখেন উহারও সম্ভবতঃ ইহাই উদ্দেশ্য যে, এমন পরিস্থিতিতে রুগীর দর্শন বৈধ। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো যে, মু'তাকিফ স্বীয় পার্থিব কাজের প্রসঙ্গে কথা-বার্তা বলতে পারে বা পারে না। তখন তিনি বল্লেন,

'খুবই প্রয়োজনের সময় করতে পারে এবং রুগী দেখার জন্যে ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে" (বদর ২১-২-১৯০৭ ইং)।

কতক কথা এমনও হয়ে থাকে যে, মানুষকে উহা করা বা না করার অধিকার দেখা হয়েছে। কিন্তু যদি উহা করা হয় তাহলে পরে আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করে সেগুলি যথাস্থানে করা যায়। ই'তিকাফেরও এই অবস্থা। আপনি চাইলে ই'তিকাফে বসেন এবং চান তো আপনার অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিত্যাগ করেন। ইহা হতে পারে না যে, আপনি যথারীতি ই'তিকাফের নিয়্যতে ই'তিকাফে বসেন আবার নিজের খেয়াল খুশীকেও নাক গলাতে দেন।

সুতরাং মসনূন (সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত) ই'তিকাফ উহাই যা কিনা আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী পালিত হয় আর যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং তা হলো এই যে, রমযানের শেষ দশকে আপনি মসজিদে রোযার অবস্থায় থাকেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাইরে না আসেন।

রমযান মাস ও সদকাসমূহ ঃ

রমযান মাসে খোদার রাস্তায় খরচ করার মধ্যে অনেক পুণ্য নিহিত। হাদীসে এসেছে যে, রমযান মাসে খরচ করতে কৃপণতা কোর না বরং নিজের ভাত-কাপড়েও খরচ করো। কেননা, এ মাসে তোমার ভাত-কাপড়ের পুণ্যও খোদার পথে খরচ করার সমান। কেননা, ঐ খরচ দ্বারাও মানুষ সেহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করে থাকে। আর এ খরচও ইবাদতের ওপরে হয়ে থাকে। এজন্যে ইহারও পুণ্য রাখা হয়েছে। হাদীসে এসেছে যে, ইহা এমন এক মাস যে, এতে মু'মিনের রিয্ক বৃদ্ধি করা হয় এবং নফল (অতিরিক্ত) দান খয়রাত যারা করেন তারা ফরযের (অবশ্য করণীয়) সমান পুণ্য লাভ করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, সব্‌চে' উত্তম ও শ্রেষ্ঠ সদকা উহা যা রমযান মাসে করা হয়ে থাকে (তিরমিযী)।

আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর বদান্যতা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রসূলে করীম (সল্লাঃ) সকলের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর রমযানে তাঁর (সল্লাঃ) দানশীলতা আরও বেগবান হতো যখন হযরত জিবরাঈল তাঁর (সল্লাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং কুরআন করীম পুনরাবৃত্তি করতেন। রসূলে করীম (সল্লাঃ) এ দিনগুলোতে তীব্র ঝড়ের বেগের চেয়েও অধিক বেগে দান খয়রাত করতেন।"

*... হাদীসে এসেছে যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর নিকট যখনই কেউ কিছু চেয়েছে তখন তিনি (সল্লাঃ) তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন নি বরং কিছু দিয়ে দিতেন।

"একবার এক ব্যক্তি আসলো, তিনি (সল্লাঃ) দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ উপত্যকায় পুরো ছাগ-পাল তাকে দিয়ে দিলেন। সে তার জাতির নিকট গেলো এবং গিয়ে বল্লো, "হে আমার জাতি ! ইসলাম গ্রহণ করে নাও। মুহাম্মদ (সল্লাঃ) এত দান করেন যে, তাঁর দারিদ্র্যের কোন ভয় নেই" (সহী মুসলিম)।

*... এক বর্ণনায় এসেছে যে, একবার আঁ হযরত (সল্লাঃ) একটি নতুন জুব্বা (বড় জামা) পরিধান করে একটি বৈঠকে আসেন। একজন সাহাবী ঐ জুব্বা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন।

*... হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই হুযূর (সল্লাঃ)-এর নিকট যাচ্ঞা করা হয়েছে বা কোন কিছু চাওয়া হয়েছে তিনি (সল্লাঃ) কখনও উত্তরে 'লা' বলেন নি। অর্থাৎ কখনও তার মুখ থেকে 'না' বের হয়নি (সহী বুখারী)।

সদকাতুল ফিতর ও উহার নিয়মাবলী ঃ

যাকাতুল ফিতর বা সদকাতুল ফিতরের জন্যে আমাদের জামাতে 'ফিতরানা' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে যে, ইহা সব মুসলমানের জন্যে আদায় করা ওয়াজিব (জরুরী) – ছোট হোক বা বড়, এমন কি ঈদের দিন যে শিশু ঈদের নামাযের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তার পক্ষ থেকেও আদায় করা জরুরী।

*... আঁ হযরত (সল্লাঃ) ফিতারানার হিকমত ও মাহাত্মাও সম্বন্ধেও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সদকাতুল ফিতর রোযাদারকে বৃথা ও নোংরা জিনিষ থেকে পবিত্র করার মাধ্যম এবং ইহা দরিদ্রদের খাবার যোগান দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে ইহা আদায় করে দেয় তখন তার সদকাতুল ফিতর বা ফিতরানা গ্রহণীয় হয়ে থাকে। আর নামাযের পরে আদায় করলে তা সাধারণ সদকা হবে, ফিতরানার অন্তর্ভুক্ত হবে না (আবূ দাউদ)।

অর্থাৎ যেভাবে মানুষের পাপ মোচনের একটি মাধ্যম 'ইস্তেগফার', নফল ও অন্যান্য ইবাদত তেমনিভাবেই সদকা বালা মুসিবত দূর করণের একটি পন্থা। ইহা পাপের প্রায়শ্চিত্তও করে থাকে। এজন্যে হুযূর (সল্লাঃ) একটি মাহাত্ম্য তো ইহা বর্ণনা করেছেন যে, রোযার মধ্যে মানুষের যে দুর্বলতা ও কমতি থেকে যায় সদকাতুল ফিতর যেন উহার প্রতিকারের পন্থা।

দ্বিতীয় মাহাত্ম্য ইহা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দরিদ্র লোক যাদের নিকট ঈদের খরচ করার মত টাকা-পয়সা নেই তাদের ঈদের আনন্দে শামেল করার জন্যে ইহা একটি পন্থা। এজন্যেই বলা হয়েছে যে, সদকাতুল ফিতর ঈদের পূর্বেই আদায় করা হোক।

ফিতরানা কখন আদায় করা যায় ঃ

রমযান আরম্ভ হওয়ার পরই সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ ইহা ঈদের নামাযের আগে ১লা শওয়াল তারিখের মধ্যে আদায় হওয়া আবশ্যক। ইহাই উৎকৃষ্টতর মনে করা হয় যে, ঈদের প্রস্তুতি নেবার জন্যে প্রথমেই গরীবদের ফিতরানা দিয়ে দেয়া হয় যেন তারাও ঈদের খুশীতে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর প্রসঙ্গে এসেছে যে, তিনি ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বে ফিতরানা দিতেন।

ফিতরানার শর্ত কী ঃ

ফিতরানা হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক সা'আ খেজুর বা উহার সমান অর্থ আদায় করা নির্ধারিত। সা'আ আরববাসীদের মধ্যে মাপের একটি পরিমাণ। এতে দুই (২) রতল হয়ে থাকে। এভাবে এক সা'আতে মোট আট পাউন্ড হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সল্লাঃ) সদকাতুল ফিতর এক সা'আ খেজুর বা যব দান করা প্রত্যেক স্বাধীন বা গোলাম নর ও নারী, বড় ও ছোট মুসলমানের জন্যে অবশ্য-কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছেন। আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, লোকেরা যেন ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে ইহা আদায় করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করেন যে, যব, খেজুর, মনাক্কা প্রভৃতির ১ সা'আ সদকাতুল ফিতর হিসেবে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে দেয়া হতো।

অবস্থানুযায়ী গমের যে মূল্য হয় এতদনুযায়ী এক সা'আ বা প্রায় দুই সের গমের মূল্যের সমান অর্থ নির্ধারিত করে দেয়া যায়। আর ইহা আদায় করে দেবার জন্যে ঘোষণা করে দেয়া হয়, যেভাবে এখানে বৃটেনে মাথা প্রতি নযরানার শর্ত দেড় পাউন্ড স্টার্লিং নির্ধারিত করা হয়েছে।

(**নোট** ঃ লেখক ইউরোপীয়ান দেশসমূহকে দৃষ্টিতে রেখে মাপ ও দ্রব্য নির্ধারণ করেছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এদেশের প্রধান খাদ্য চাউলকে ও সরকারী মূল্যকে প্রেক্ষাপটে রেখে ফিতরানার টাকার অংক নির্ধারিত করা যেতে পারে – অনুবাদক)

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২৩-২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৮ সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ – **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

ওয়াকফে নওদের যতদূর সম্ভব উত্তম তেলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআনের অনুবাদও শিক্ষা দিন

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

"ক্বারী (যিনি শুদ্ধ কুরআন করীম তেলাওয়াত করতে পারেন- অনুবাদক)দু'করমের হয়ে থাকে। এক তো তিনি যিনি ভালভাবে তেলাওয়াত করেন এবং তার সুরে একটি আকর্ষণী শক্তি থাকে এবং তিনি তজবীদ (শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের নিয়মাবলী) সঠিকভাবে পালন করেন। কিন্তু কেবল পূর্ণ আকর্ষণী শক্তি সম্বলিত সুরের তেলাওয়াতে প্রকৃত প্রাণ সৃষ্টি হয় না। এখন ক্বারী যদি কুরআন করীমের অনুবাদ না জানেন তাহলে ঐ তেলাওয়াতের মূর্তি তো বানিয়ে দিয়ে থাকে, তেলাওয়াতে জীবন্ত দেহ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ঐ ক্বারী যিনি অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করেন এবং তেলাওয়াতের ঐ বিষয়-বস্তুর ফলে তার প্রাণ উছলাতে থাকে তার প্রাণে খোদার ভালবাসার আবেগ উত্থিত হতে থাকে। তার তেলাওয়াতে এমন একটি কথা সৃষ্টি হয়ে যায় যা কিনা তেলাওয়াতের আসল প্রাণ। তাই এমন ঘর যেখানে ওয়াফেকীনে নও অবস্থান করছে সেখানে তেলাওয়াতের এ দিকে বিশেষ সৃষ্টি দেয়া দরকার। স্বল্প পড়ালেও অনুবাদের সাথে যেন পড়ালো হয় – উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যেন পড়ানো হয়। আর শিশুদের মধ্যে এ অভ্যাস সৃষ্টি করা হয় যে যতটুকুই তারা তেলাওয়াত করে, তা যেন বুঝে করে। একতো দৈনন্দিন সকালে তেলাওয়াত করা। এতে তো ইহা হতে পারে যে, না বুঝেও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে কুরআন করীম আপনাদের পড়াতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর অনুবাদও শিখাতে ও ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার কর্মসূচীও প্রবহমান রাখা উচিত" (খুতবা জুমুআ, ১০-২-১৯৮৯)। [আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ঃ ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল '৯৮ সংখ্যা]

সংগ্রহ ও অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

ওয়াকফে নও মুজাহিদগণের সাথে পরিচিত হোন

নং- ২৭৭০ বি
সালেহা এহসান
পিতা- এহসানুল আলম, মাতা- মোবারকা বেগম
দাদা- মোহাম্মদ উবায়দুর রহমান (ঢাকা)
নানা- ফজল আহমদ
৯২, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁ, ঢাকা

নং- ৭৬১ এ
১। তারেক আহমদ
২। আমাতুল হাফিয (এমু)
৩। হুব্বাতুল ওয়াহিদ
পিতা- মাহমুদ আহমদ শরীফ, মোয়াল্লেম
মাতা- মোসা: সেলিনা শরীফ
দাদা- আহসান উল্লাহ পাটওয়ারী, মোয়াল্লেম
আহমদনগর, পঞ্চগড়

নং- ১৭৩২ এ
হুমদা ইয়াসমীন মিশু
পিতা- মনির হোসেন
মাতা- হাসনাহেনা
দাদা- মরহুম ময়েনউদ্দীন আফ্রাদ (নাটোর)
নানা- ডাঃ নূরুজ্জামান (মুন্সীগঞ্জ)
মল্লিকহাটি, নাটোর (বর্তমানে বগুড়া)

হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি– সদৃশ বিধান চিকিৎসা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

ভূমিকা

১৯৬০-এর পূর্বের কথা। তখন আমার বারে বারে মাথা ব্যথা হতো– ইংরেজীতে যাকে MIGRAINE আর উর্দূতে 'দার্‌দে শাকীকা' বলে। এতে প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয় তৎসঙ্গে মাথাঘোরা, বমি আর স্নায়বিক অস্থিরতাও খুব বেশি হয়ে থাকে। বেশ ক'দিন একাধারে আমি এই রোগে আক্রান্ত থাকতাম। চিকিৎসা-স্বরূপ আমি 'এসপিরিন' ব্যবহার করতাম যার কারণে পেটের অভ্যন্তরের ঝিল্লি আর কিডনিতে কুপ্রভাব বিস্তার লাভ করতো। আবার হৃদস্পন্দনও বেশ বেড়ে যেতো। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযিঃ) একটি এলোপ্যাথি ঔষধ SANDOL আমার চিকিৎসার্থে প্রদান করতেন। এটি পাকিস্তানে পাওয়া যেতো না বরং কোলকাতা থেকে আনাতে হতো। এটি ব্যবহারে আমি স্বস্তি পেতাম।

একবার আমি যখন মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হই তখন হযরত আব্বাজানের কাছে স্যানডল (SANDOL) ছিল না। তাই এর স্থলে তিনি আমার জন্য একটি হোমিও ঔষধ পাঠিয়ে দেন। সে যুগে হোমিওপ্যাথির উপর আমার কোনো আস্থা ছিল না, কিন্তু 'তাবাররুক' স্বরূপ আমি ঔষধটি খেয়ে নিই। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, আমি অযথা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি অথচ আমার মাথা ব্যথা একেবারেই নেই! ইতঃপূর্বে অন্য কোনো ঔষধ আমার উপর এত অসাধারণ দ্রুত কার্যকর হয় নি।

এরপর সংঘঠিত অপর একটি ঘটনা হোমিওপ্যাথি বিষয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হয়। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার স্ত্রী আসেফা বেগমের (রাহেমাহাল্লাহু) একটি পুরোনো ব্যাধি ছিল। তিনি আমার কাছে সেটা ব্যক্ত করেন। হযরত আব্বাজানের কাছে অনেক হোমিও বই-পুস্তক ছিল। আমি সেগুলো ঘেঁটে সঠিক ঔষধ বের করার মনস্থ করলাম। আল্লাহ্‌তাআলার কী ইচ্ছা দেখুন! প্রথম বইটি হাতে নিয়ে যেখানটা আমি খুল্‌লাম সেখানেই ন্যাট্রাম মিউর (NATRUM MUR) নামক একটি ঔষধের সব লক্ষণাবলী আসেফা বেগম বর্ণিত লক্ষণসমূহের সাথে হুবহু মিলে গেল। আমি তাঁকে উচ্চ শক্তির এই ঔষধ প্রদান করি। এটি একবার সেবন করাতেই তাঁর কষ্ট এমনভাবে দূরীভূত হলো যে, দ্বিতীয়বার তাঁর সেই কষ্টই আর হয় নি। এথেকে আমি নিশ্চিত হলাম, আমি বুঝি বা না-ই বুঝি হোমিওপ্যাথি অবশ্যই উপকারী আর এর মাঝে নিশ্চয়ই গভীর সত্য নিহিত। এরপর থেকে আমি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর লাইব্রেরী থেকে হোমিও চিকিৎসা বিষয়ক বই-পুস্তক নিয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করলাম। কখনও কখনও সমস্ত রাত জেগে বইগুলো পড়েছি। এক দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নের পর ঔষধসমূহ ও এগুলোর লক্ষণ সম্বন্ধে আমি পরিচয় লাভ করি। এগুলোর ব্যবহার বিধি ও বিশেষ প্রভাব ভালভাবে বুঝে নিই। এরপর আমি রোগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করি। (ক্রমশ:)

অনুবাদ : আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

নোট : ইতঃপূর্বে হুযূর (আইঃ) কর্তৃক প্রণীত হোমিওপ্যাথি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশ পাচ্ছিলো। কিন্তু যেহেতু মূল পুস্তকের মুদ্রণে বেশ কিছু ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাই হুযূর (আইঃ) পুস্তকখানাকে স্থগিত ঘোষণা করেন। পুস্তকখানা সংশোধিত আকারে গত ইদ, কে, জলসার সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এ মূল্যবান ও কল্যাণপ্রদ পুস্তকখানার বঙ্গানুবাদ এখন থেকে প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হলো। এতদ্দ্বারা পাঠকবৃন্দ নিজেরাও উপকৃত হবেন এবং নিজ এলাকার হোমিও চিকিৎসকদেরও সাহায্য করবেন– এটাই আমাদের কাম্য।

–সহকারী সম্পাদক

নিত্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবস্থাপত্র

(১) যে শিশুরা পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে সব পড়া ভুলে যায় বা Confused হয়ে যায় তাদের ইথুজা (Aethusa) ২০০ ব্যবহার করা উচিত।

(২) যেসব ছাত্র পরীক্ষাকে ভীষণ ভয় পায় তাদের আরজেনটাম নাইট্রিকাম (Argentum Nitricum) আর ইথুজা (Aethusa) ২০০ মিশিয়ে সেবন করা উচিত। (ক্রমশঃ)

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা

সচিত্র প্রতিবেদন

রিপোর্ট প্রকাশ, এবারের বন্যা পূর্ববর্তী ৪৫ বছরের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এ পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি লোক বন্যার প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত। ৫৫ জেলার ৩৭৭ থানায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ৭৬ লাখ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬১টি এখন বন্যা কবলিত। ২৭টি ওয়ার্ডের অবস্থা করুণ।

ইতঃমধ্যে বন্যার প্রকোপে প্রায় ৪০০-এর কাছাকাছি সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। বিপন্ন লোকদের আহাজারিতে ত্রাণ শিবিরগুলোর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। সারা দেশে সড়ক জনপথ ও রেল যোগাযোগ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত হয়েছে।

বন্যার প্রকোপ হ্রাস ও শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে নদীর গভীরতা বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে নদী খননের প্রয়োজনীয়তার ওপরে গুরুত্বারোপ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জরুরী ত্রাণ ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচীর জন্য বাংলাদেশ দাতাগোষ্ঠির কাছ থেকে ৫০ কোটি ৮৩ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার এবং ১০ লাখ ৩৮ হাজার মেট্রিন টন খাদ্য সাহায্য চেয়েছে। ইতঃমধ্যে এ ব্যাপারে ভাল সাড়াই পাওয়া গেছে।

বন্যার করালগ্রাসে বাংলাদেশের আমন ফসলের বীজ একবার নষ্ট হয়ে গেছে। যদি সত্ত্বর পানি নেমে না যায় তাহলে এবার অনেক স্থানে এবার আমন ফসলের চাষই করা সম্ভব হবে না বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। ফলে খাদ্য-সংকট ব্যাপকভাবে দেখা দিবে বলেও অনেকে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি ও এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্যে সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল যে কোন সময়ে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে পারে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কতিপয় স্থানে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে রিলিফ বন্টন করেছে এবং আরও করার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গত ২৮-৮-৯৮ইং শুক্রবার জুমুআর নামাযে দেশকে বালা মুসীবত থেকে রক্ষার জন্যে ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্যে বিশেষ দোয়া করা হয় ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে।

– আহমদী প্রতিবেদক

ছবি ঃ দৈনিক পত্র-পত্রিকার সৌজন্যে

সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা

পরবর্তীতে আরো যারা সীরাতুন্নবী (সঃ)-এর জলসা করেছেন তারা হলেন : আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা (খালিশপুর হালকা), মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনা এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। *–আহমদী বার্তা*

এ বর্বরতার চিহ্ন কি দিয়ে ঢাকবেন?

মংলা প্রতিনিধি (২২শে শ্রাবণ, ১৪০৫) ॥ মংলা শহরের কলেজ রোড এলাকায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপসনালয় ভাংচুরকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উগ্র মৌলবাদী সম্প্রদায় কর্তৃক গত ২২শে জুলাই '৯৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার মংলা হালকাস্থ ভাংচুরকৃত মসজিদের একাংশের ছবি

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জনৈক ফতেহ আলীর বাড়িতে নির্মিত একটি নামাজের ঘরে গত মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে ৫০/৬০ জন লোক হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। ভাংচুরকারীদের মতে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক ফতেহ আলী তার বাড়িতে কাদিয়ানী মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম ধর্মে আঘাত করার চেষ্টা করছিল। অপরদিকে, ফতেহ আলী জানান, মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে বেআইনীভাবে হামলা চালিয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি" *(বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)*।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় তালীম ও তরবীয়তি ক্লাস সুসম্পন্ন

মহান আল্লাহ্তাআলার ফযলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের পনর দিন ব্যাপী ২৪ তম কেন্দ্রীয় তালীম ও তরবীয়তী ক্লাস গত ৭ই আগষ্ট '৯৮ হতে শুরু হয়ে ২১শে আগষ্ট '৯৮ তারিখে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী ও মাতাপিতা দিবস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় (আল্হামদুলিল্লাহ্)। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। এবারের ক্লাসে ৪টি রিজিওনের ৩৮টি স্থানীয় মজলিস হ'তে ১৪৫ জন খাদেম ও ৭০ জন তিফল অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, উক্ত ক্লাসে ৩০ জনের মত নতুন আহমদী ও ৭ জন জেরে তবলীগ বন্ধুও অংশ নেন। *–আহমদী বার্তা*

২৭তম বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ২, ৩, ও ৪ অক্টোবর '৯৮ যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ২৭ তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা '৯৮ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ্। সঠিক প্রস্তুতির জন্য ইজতেমার সিলেবাস পাঠানো হয়েছে। উক্ত ইজতেমায় সকল খোদ্দাম ও আতফালকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। *–আহমদী বার্তা*

বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ '৯৮

গত ১৮-২৪ শে জুলাই পর্যন্ত মজলিসে খোদ্দামূল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে "বৃক্ষ রোপণ" সপ্তাহ পালিত হয়। উক্ত বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহে মোট ২০ (কুড়ি) টি বৃক্ষ লাগানো হয়। স্থানাভাবে বেশী গাছ লাগানো সম্ভব হয় নি। *–আহমদী বার্তা*

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

২৯ শে আগষ্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট লাজনা ও নাসেরাত ৪০০ জন উপস্থিত ছিল। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে ২টা অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। এর পর খাওয়া-দাওয়া ও নামাযের জন্য বিরতি দেয়া হয়। পরে ২য় অধিবেশন হয় দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতারমা সদেকা হক সাহেবা, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতারমা মাকসুদা রহমান, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন মোহতারমা মাসুদা সামাদ চৌ: সাহেবা, প্রাক্তন সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করে শুনান মিসেস মরিয়ম সিদ্দীকা। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী। উর্দু নযম পড়ে সামিয়া ইউসরা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মোহতারমা মাকসুদা রহমান সাহেবা। নযম পড়ে আসেফা খাতুন (তুষ্টি)। বক্তৃতা দেন "মালি কুরবানী" বিষয়ে মোহতারমা মাকসুদা রহমান সাহেবা। নযম পড়ে মাহমুদা রুমানা ইসলাম (ময়না)। বক্তৃতা দেন আদব কায়দা ও নিয়ম কানুন বিষয়ে মোহতারমা হোসনে আরা তাসাদ্দক সাহেবা, জেনারেল সেক্রেটারী লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। বক্তৃতা দেন মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য তালীম তরবীয়ত, সত্যবাদিতা, পরনিন্দা, পরচর্চা বিষয়ে মোহতারমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী। সবশেষে সভাপতির ভাষণ দ্বারা প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দুপুর ২টা থেকে দ্বিতীয় অধিবেশনের সভানেত্রী মোহতারমা সাদেকা হক। প্রধান অতিথি মোহতারমা মাকসুদা রহমান সাহেবা, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাসুদা সামাদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করে শুনান মিসেস রওশন জাহান বেগম। নযম পড়ে (উর্দু) মাদাহ সালাম। এরপর লাজনাদের জন্য প্রতিযোগিতা হয় ২ বার। ১ম বার কুইজ ধর্মীয় জ্ঞান ও দীনি মালুমাত বিষয়ে, ১৮ জন করিয়া ২ দল ছিলেন ক এবং খ দল। ২য় বার খেলা বালিশ ছোঁড়া। এতে প্রায় ৬০ জনের মত অংশ গ্রহণ করেন। এভাবেই নাসেরাতদেরও প্রতিযোগিতা – ১২ জন করিয়া ২ দল ছিল (কুইজ -ধর্মীয় জ্ঞান ও দীনিমালুমাত বিষয়ে) বালিশ ছোঁড়া ৩০ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করে। সবশেষে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন মোহতারমা মাকসুদা রহমান সাহেবা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রহিমা জাকির, জেনারেল সেক্রেটারী লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ৪র্থ ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

রহিমা জাকির
জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা।

বস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর পক্ষ হতে ঢাকার অদূরে বাহের চর বন্যা কবলিত এলাকায় গত ১/৮/৯৮ ইং রোজ শনিবার কায়েদ এ,এস,এম, ওয়াহিদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে বন্যা কবলিত লোকদের মাছে বস্ত্র সামগ্রী বিতরণ করা হয়। – এহসান উল আলম, মোতামাদ ম: খো: আ: তেজগাঁও।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর

অব্যাহত অগ্রযাত্রায়

আমাদের

অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own. **with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.**

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

New Vol. No. 61 ● 4th Issue
August 31, 1998 Tk. 10.00
Fortnightly
The AHMADI
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

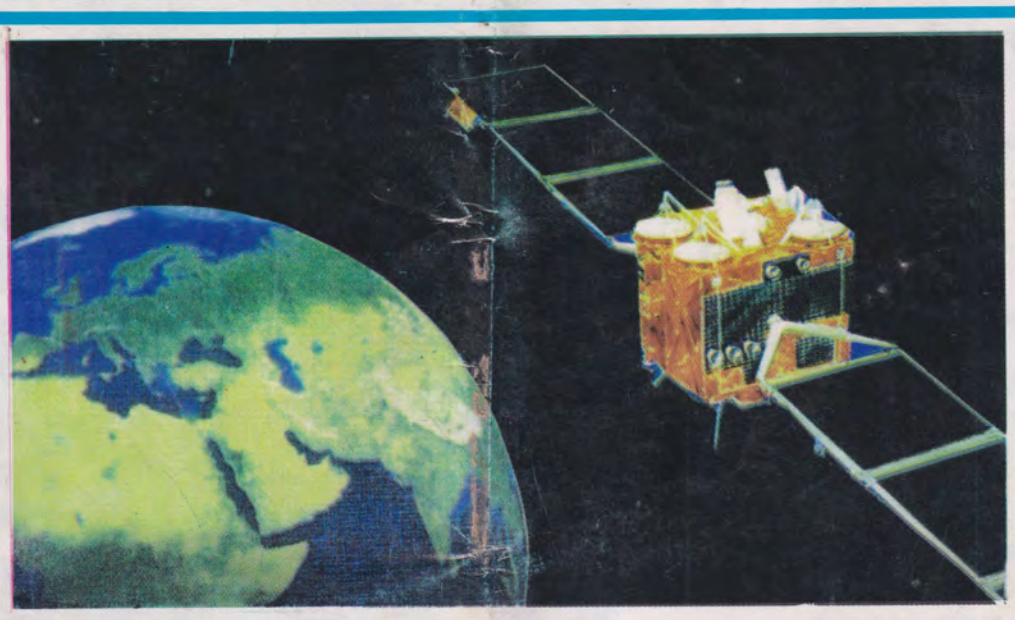

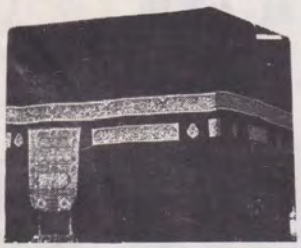

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272